খিতনার নীতিমালা

আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

ভূমিকা

[illegible]

ফিতনার আভিধানিক অর্থ পরীক্ষা বা যাচাই করা। পারিভাষিক ও ব্যবহার অর্থে প্রত্যেক অপ্রীতিকর বস্তু বা বিষয় দ্বারা কাউকে পরীক্ষা বা যাচাই করাকে বলে। তাই প্রত্যেক অপ্রীতিকর বিষয় বা ঘটনাকে ফিতনা বলা হয়। যেমন অকস্মাৎ বিপদ, বিপর্যয়, আযাব, সমস্যা, বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, বিচ্ছিন্নতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহযুদ্ধ, ধর্মদ্রোহিতা, কুফর, শির্ক, পাপ, প্রলোভন, নির্যাতন, অবৈধ বা অতিরিক্ত নারী বা পার্থিব প্রেম প্রভৃতিকে ফিতনা বলা হয়।

বিশেষ অর্থে ফিতনা মুসলিমদের আপোসের সেই দ্বন্দ্ব বা কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহকে বলে, যা নিছক পার্থিব কোন স্বার্থকে কেন্দ্র করে ঘটে থাকে; যাতে কোন্ পক্ষ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী, তা সঠিকভাবে বুঝা যায় না।

ফিতনা আসে একাধিক কারণে। যেমন ঃ-

❁ কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশীর পূজা তথা মনোবৃত্তি বিকৃত

হওয়া।

❁ কোন ব্যক্তি বা জামাআতের ভক্তি অথবা অভক্তিতে অতিরঞ্জন করা।

❁ সহীহ দাওয়াত-পদ্ধতি অবলম্বন না করা এবং রূপক বা দ্ব্যর্থবোধক দলীলের অনুসরণ করা।

❁ কোন বিষয়ে জলদিবাজী করা এবং বিবেক-বিবেচনায় অধৈর্য হওয়া। ইত্যাদি।

ফিতনা ছোট-বড় যেমনই হোক, তার কামনা করা মোটেই উচিত নয়। যে বিপদ-বালা বহন করার ক্ষমতা রাখে না, তা বহন করতে চাওয়াও উচিত নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়।" সাহাবাগণ বললেন, 'নিজেকে লাঞ্ছিত কিভাবে করবে হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেই বিপদকে সে বহন করতে চায়, যা বহন করার ক্ষমতা সে রাখে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৭৯৭ নং)*

বলা বাহুল্য, অযথা হিম্মত প্রকাশ করে কোন ফিতনার প্রবেশ-দ্বার উন্মুক্ত করা অন্ততঃপক্ষে কোন আলেমের জন্য সমীচীন নয়।

দ্বীন ও দুনিয়ার সকল প্রকার বিপদ আপদ থেকে পানাহ চাইতে আমাদের শরীয়ত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। কোন শত্রুর মোকাবেলা করার কামনা করতেও নিষেধ করে শরীয়ত। নিরুপায় অবস্থায় হালালকে হারাম করেছে, জীবন বাঁচাবার জন্য কুফ্রী কথা বলারও অনুমতি দিয়েছে। সুতরাং নিজে থেকে কোন বিপদ ডেকে আনা, খাল কেটে কুমীর আনা, জলের ছিটা দিয়ে লগির গুঁতো খাওয়া, মৌচাকে খামাকা ঢিল মেরে মৌমাছির জ্বালাময় বিঁধুনি খাওয়া নিশ্চয় কোন জ্ঞানীর কাজ নয়।

ফিতনা থেকে বাঁচার বিভিন্ন উপায় আছে। যে কোনও মুসলিম ইচ্ছা করলে সেই সকল উপায় অবলম্বন করে ফিতনা থেকে রক্ষা পেতে পারে। যার কিছু নিম্নরূপ ঃ-

❁ কিতাব ও সুন্নাহর নির্ভেজাল নীতির অনুসরণ। তাতে আছে সর্বপ্রকার উপায়-ব্যবস্থা।

❁ পরিণাম ও দূরদর্শিতা। যে পরিণামের কথা ভাবে না এবং প্রবেশের আগে নিকাশের উপায় চিন্তা করে নেয় না, সে আসলে জ্ঞানী নয়। আর সে ফিতনা থেকে

বাঁচতে পারে না। শরীয়তের সাধারণ নীতি হল, মঙ্গল আনয়নের চেয়ে অমঙ্গল দূর করাটাই অগ্রগণ্য। শরীয়ত এসেছে কল্যাণের পূর্ণতা আনয়ন এবং অকল্যাণ প্রতিরোধ ও হ্রাস করণের উদ্দেশ্যে। এ জন্যই মহান আল্লাহ গায়রুল্লাহর নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন। মক্কী জীবনে মহানবী ﷺ শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিশোধ নেন নি। মাদানী জীবনে তিনি মুনাফিকদেরকে হত্যা করেন নি। হিকমত অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় মুসলিমের জন্য। অবশ্য সুবিধাবাদী হতে বলছি না। কোন অনিশ্চিত অমঙ্গলের আশঙ্কায় কোন নিশ্চিত মঙ্গলকে অগ্রাধিকার না দিয়ে বর্জন করাও জ্ঞানীর উচিত নয়।

❁ বিগত জাতির ইতিহাস থেকে উপদেশ গ্রহণ। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ইতিহাসে ফিতনার বহু কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সে সব কাহিনী পড়ে মুসলিম ফিতনার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করে ফিতনা থেকে বাঁচতে বারে।

❁ আবেগ ও মনের জোশ সংবরণ করা এবং প্রবল উত্তেজনায় কোন কিছু করে না বসা। কারণ, ঘটনাপ্রবাহে নিজেকে সংযমিত না করতে পারলে হুঁশ হারিয়ে অদম্য মনে এমনও কাজ হয়ে যেতে পারে, যাতে ফিতনার আগুন প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে।

❁ হক, ন্যায় ও সত্য জানার পর তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। সত্য প্রকট হলে সকল প্রকার ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা ও কুণ্ঠাবোধ অসংকোচে বর্জন করা। এমন না হলে ফিতনার থাবা গ্রাস বানিয়ে ছাড়বে।

❁ বিশেষ করে ফিতনার সময় হকপন্থী রব্বানী উলামার সাহচর্য গ্রহণ করা। তাঁদের পথনির্দেশ মত পথ চললে মুসলিম ফিতনা থেকে খুব বাঁচতে পারে।

❁ মহান আল্লাহর কাছে ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা। তিনি বাঁচালে সহজেই ফিতনা থেকে বাঁচা সম্ভব, নচেৎ অসম্ভব।

আসুন আমরা সর্বপ্রকার অন্ধ ফিতনা থেকে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে আশ্রয় প্রার্থনা করি ঃ-

[illegible])

[illegible]

[illegible]

[illegible].

হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের উৎপীড়নের পাত্র করো না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের পীড়নের পাত্র করো না। তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর হে আমাদের প্রভু! তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট সৎকর্ম করার ও অসৎ কর্ম ত্যাগ করার প্রেরণা এবং দীন-হীনদের ভালোবাসা প্রার্থনা করছি। আর চাচ্ছি যে, তুমি আমাকে ক্ষমা কর ও দয়া কর। আর যখন তুমি কোন সম্প্রদায়কে ফিতনায় ফেলার ইচ্ছা করবে তখন আমাকে বিনা ফিতনায় মরণ দিও। আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা ও তার ভালোবাসা যে তোমাকে ভালোবাসে এবং সেই কর্মের ভালোবাসা যা আমাকে তোমার ভালোবাসার নিকটবর্তী করে তা প্রার্থনা করছি। *(মুঃ আহমদ ৫/২৪৩, সঃ তিঃ ২৫৮২নং, হাকেম ১/৫২১)*

প্রকাশ যে, ফিতনার নীতিমালা সম্বলিত অত্র পুস্তিকাখানি ফযীলাতুশ শায়খ সালেহ বিন আব্দুল আযীয আলে শায়খের 'আয-যাওয়াবিতুশ্ শারইয়্যাহ লিমাওক্বিফিল মুসলিমি ফিল ফিতান' শীর্ষক বক্তৃতার ছত্রছায়ায় লিখিত। ফিতনা প্রত্যেক দেশে প্রায় একই ধরনের; বিভিন্ন রকমের। তাই এই পুস্তিকার মান বাংলাভাষী মুসলিম উম্মাহর নিকট কোন অংশে কম নয় বলেই আমার নিজের তথা সকলের জন্য ফিতনার করাল গ্রাসে জর্জরিত অবস্থায় মুক্তির অসীলাস্বরূপ এই পথনির্দেশিকা লিখতে প্রয়াস পাই।

মহান আল্লাহর নিকট এই কামনা করি যে, তিনি যেন আমার তরফ থেকে এ আমলকে কবুল করে নিন এবং তার অসীলায় দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের সকল প্রকার ফিতনার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেন। আমীন।

বিনীতঃ
আব্দুল হামীদ ফাইযী
আল-মাজমাআহ
সঊদী আরব
যুল-ক্বা'দাহ ১৪১৫হিঃ

অবতরণিকা

সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি বলেন, আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নির্ধারিত করেছি (ইবাদতের) নিয়ম-কানুন, যা ওরা পালন করে; সুতরাং ওরা যেন

তোমার সঙ্গে (শরীয়তের) ব্যাপারে বিতর্ক না করে। তুমি ওদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। তুমি তো সরল পথেই আছ। ওরা যদি তোমার সঙ্গে তর্ক করে তবে বল, 'তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সম্যক্ অবহিত। তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ, আল্লাহ কিয়ামতের দিন সে বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দেবেন।" *(সূরা হজ্জ ৬৭-৬৯ আয়াত)*

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি বলেন, আল্লাহ কি তাঁর দাসের জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখায়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার জন্য কোন পথ-প্রদর্শক নেই এবং যাকে তিনি পথনির্দেশ করেন, তাকে ভ্রষ্টকারী কেউ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী নন কি?" *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)*

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। যিনি একক, যাঁর কোন অংশীদার নেই -তার মত সাক্ষ্য, যার হৃদয়াত্মা কালেমা তাওহীদের পূতবারিতে পরিপ্লুত। যার ফলে সে জেনেছে, আল্লাহ কোন্ কথা ও কাজ ভালোবাসেন এবং কিসে তিনি সন্তুষ্ট।

আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস, প্রেরিত দূত ও মনোনীত বন্ধু। যিনি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী। যিনি মানুষের নিকট তাঁর আহবান পৌঁছে দিয়েছেন। যিনি উম্মতকে সকল কল্যাণকর শিক্ষাই দান করে গেছেন। অতএব সুসংবাদ তাদের জন্য, যারা তার আদর্শ ও সুন্নাহর অনুসারী এবং তাঁর হেদায়াতের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত।

আল্লাহ তাঁর উপর, তাঁর বংশধর, পরিবার, সাহাবাবৃন্দ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের অনুগামীদের উপর করুণা ও আশিস অবতীর্ণ করুন। আমীন।

বেরাদারানে ইসলাম! আল্লাহর কাছে ফিত্না থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করুন। যে ফিতনা আগুনের মত দ্বীন, বিবেক-বুদ্ধি এবং দেহ-আত্মা জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। সমূদয় মঙ্গলকে ধূলিসাৎ করে ফেলে -এমন ফিতনা থেকে মহান আল্লাহর কাছে বারবার পানাহ চান।

ফিতনায় কোন প্রকার কল্যাণ নেই। ফিতনায় পড়ে গেলে বাঁচার পথ চেনা বড় কঠিন। তাই মহানবী ﷺ মহান আল্লাহর কাছে বারবার ফিতনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এবং এ বিষয়ে উম্মতকে খুব বেশী বেশী সতর্ক ও সাবধান করতেন।

ফিতনা সৃষ্টিহয় (সীমালংঘনকারী ও অতিরঞ্জনকারী) যালেমদের নিকট হতে। কিন্তু তার তিক্তফল কেবল যালেমরা একাই ভোগ করে না; বরং তাদের সাথে তারাও সে কুফল ভোগ করতে বাধ্য হয়, যারা যুলমে শরীক নয়। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষই সেই ফিতনাঘটিত আপদের শিকার হয়ে যায়। যাঁতা যখন পিষতে শুরু করে, তখন বাচ-বিচার না করেই 'হেঁটকার সাথে মসুরীকেও পিষে' ধ্বংস করে ছাড়ে।

সুতরাং আমাদের জন্য ওয়াজেব হল, ফিতনা আসার পূর্বে নিজেদেরকে সাবধান হওয়া এবং প্রত্যেক সেই বিষয় থেকে নিজেদেরকে বহু দূরে রাখা, যা আমাদেরকে ফিতনার নিকটবর্তী করে। কারণ, আমরা শেষ যামানার উম্মত। যে যামানায় ফিতনার প্রাদুর্ভাব বেশী আকারে দেখা দেবে। যেমন এর নিদর্শনের প্রতি ইঙ্গিত করে মহানবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেন, "সময় সংকীর্ণ হবে, কাজ অল্প হয়ে যাবে, কৃপণতা প্রক্ষিপ্ত হবে এবং বেশী বেশী ফিতনার প্রাদুর্ভাব ঘটবে।" *(বুখারী)*

ফিতনা শুরু হলে তারই মাঝে বড় বড় বিঘ্ন ও বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হবে মনুষ্য-সমাজে। আর তার প্রতিক্রিয়া কিয়ামতকে নিকটবর্তী করবে।

দয়ার নবী ﷺ আমাদের প্রতি দয়া করেই সকল প্রকার ফিতনা থেকে আমাদেরকে সতর্ক করে গেছেন। আর দয়াময় আল্লাহও কুরআন মাজীদে আমাদেরকে এ বিষয়ে হুশিয়ার করেছেন। তিনি বলেন,

﴿[illegible]﴾

অর্থাৎ, তোমরা ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। *(সূরা আনফাল ২৫ আয়াত)* বরং সকলকেই গ্রাস করে ছাড়বে।

হাফেয ইবনে কাসীর (রঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এই আয়াতে সম্বোধন যদিও সাহাবায়ে কেরামকে করা হয়েছে, তবুও তা সকল মুসলিমের জন্য সতর্কবাণী। কারণ, নবী ﷺ ফিতনা থেকে সতর্ক করতেন।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আলুসী বলেন, ঐ আয়াতে উল্লেখিত 'ফিতনা'র তফসীর বিভিন্নভাবে করা হয়েছে। ফিতনার ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, তা হল সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদানে তোষামদ করা, অনৈক্য ও কলহ-বিবাদ, বিদআত প্রকাশ পেলে তা ঘৃণাবোধ ও প্রতিহত না করা ইত্যাদি। আর কাল-পাত্র ভেদে সকল ব্যাখ্যাই যথাস্থানে সঠিক।

অতএব আমাদের এ যুগ যদি অনৈক্য ও আপোসের কলহ-বিবাদের যুগ হয়, তাহলে আমাদের উচিত, একে অপরকে এই কথার মাধ্যমেই সাবধান করা, তোমরা ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ করে তোমাদের মধ্যে যারা যালেম কেবল তাদেরকেই ক্লিষ্ট করবে না। বরং সকলকেই এক সঙ্গে গ্রাস বানিয়ে ছাড়বে।

অর্থাৎ, ঐক্যহীনতা ও মতবিরোধকে ভয় কর, যার মন্দ পরিণাম ও কুফল কেবল অত্যাচারী ও অপরাধীরাই ভোগ করবে না, বরং তা সকলকেই সমানভাবে ভোগ করতে হবে।

এই কঠিনতম পরিস্থিতিতে আমরা সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক করা এবং তা নিয়ে কিছু সদুপদেশ দান করার চেষ্টা করব। ইন শাআল্লাহ। যেহেতু আল্লাহর ইচ্ছায় আজ প্রায় সারা বিশ্বে ইসলামী পুনর্জাগরণ শুরু হয়েছে। প্রায় সকল দেশে তাওহীদের পতাকা উত্তোলিত, তাওহীদের আহবান আকাশে-বাতাসে মুখরিত হয়ে উঠছে। অতএব এই অবসরে আমাদের উচিত, সদুপদেশ গ্রহণ করা, ফলপ্রসূ ইল্ম অনুসন্ধানে যত্নবান হওয়া, সলফে সালেহীনের আকীদাহ বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল রাখতে চেষ্টাবান হওয়া এবং আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের মৌলিক বিশ্বাস ও নীতিপথ অবলম্বন করতে প্রয়াসী হওয়া।

এই পবিত্র ও বর্কতময় নব জাগরণ; যে জাগরণে আল্লাহর দ্বীন প্রচার ও প্রসার লাভের আশা করতে পারি, যাতে শরীয়ত ও তাতে প্রতিষ্ঠিত থাকা মানুষের নিকট

প্রিয় হয়ে উঠবে। আরো আশা করি যে, ঐ নব জাগরণ সমৃদ্ধি লাভ করবে ফলপ্রসূ ইল্ম (কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ) ও আমলের উপর ভিত্তি করে। যেহেতু আজকের যুব সমাজ আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের নীতিকথা ও ফলপ্রসূ ইল্ম জানতে ও মানতে বড় আগ্রহী। ফাল-হামদু লিল্লাহ।

তাই বিশেষ করে তাঁদের উদ্দেশ্যেই, সেই নবীন উদীয়মান যুব সৈনিকদের জন্যই এই পুস্তিকার অবতারণা, যাতে তাঁরা চলার পথে আলো পান।

ফিতনার অবস্থা ও গতিবিধির প্রতি যদি লক্ষ্য না রাখা হয়, তার ভয়ানক পরিণামের প্রতি যদি ভ্রূক্ষেপ না করা হয়, তাহলে অবশ্যই ভবিষ্যতে খুবই নিকৃষ্ট ও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে সর্বনাশ আনয়ন করে। কেউ বা সেই সময় অনুচিত আচরণ করে, কেউ অসমীচীন বাক্য প্রয়োগ করে, কেউ অজান্তে কটু মন্তব্য করে, কেউ বা নিরপরাধের প্রতি খামাখা কুধারণা রেখে অপবাদের বিষবাণ ছাড়ে। বিশেষ করে সে স্থলে যদি কোন সত্যপ্রিয় ও পরিণামদর্শী আলেম না থাকেন, যিনি পরিস্থিতির বিবর্তনের সাথে এবং ফিতনার প্রাদুর্ভাবের সময় সমাজকে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশিত আলোকিত পথ প্রদর্শন করেন। যিনি শরয়ী নীতি ও সূত্রমালার সাহায্যে সমাজের চলার পথ ও গতি নিয়ন্ত্রণ করেন।

মুসলিম হয়ে বাঁচতে হলে ইসলামের নীতি ও নৈতিকতা মেনে চলতেই হয়। আর এর ফলে সে ভ্রষ্ট হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। যার রীতি মত অনুসরণ কল্যাণ লাভের সকল দুয়ার উন্মুক্ত করে দেয় এবং ইহ-পরকালে তাকে কোন প্রকার লাঞ্ছিত, লজ্জিত ও হীনতাগ্রস্ত হতে হয় না।

প্রত্যেক কাজের নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, সূত্র আছে; যা মুসলিমকে জানতেই হয়। আর তা জানা থাকলে সে তার সাহায্যে নিজেকে লাইনচ্যুত হওয়া থেকে বাঁচাতে পারে এবং লাইন ধরে নেওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, যার শেষ পরিণতি মোটেই প্রশংসার্হ নয়। অথবা যার গন্তব্যস্থল তার জন্য মঙ্গলময় নয়। বলা বাহুল্য এ জন্যই তার জন্য একান্ত জরুরী হল, সেই নীতিমালা ও সূত্রাবলীকে জানা, যা আহলুস সুন্নাহ অল-জামাআর উলামাগণ কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ থেকে চয়ন ও

নির্ধারণ করেছেন।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে, তারা অবশ্যই বহু মতবিরোধ দর্শন করবে। অতএব (সেই সময়) তোমরা আমার ও আমার পরবর্তী সুপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরো। (আপ্রাণ চেষ্টার সাথে) তা দাঁত দ্বারা শক্ত করে ধারণ করো।” আর সত্য-সত্যই তাঁর পরলোক গমনের পর সাহাবাবৃন্দ মতবিরোধ দেখতে পেলেন এবং তাঁরা কেবলমাত্র তাঁর ও তাঁর পরবর্তী খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ এবং নীতির সাহায্যেই এমন ভয়ঙ্কর ফিতনার সময় নিস্তার লাভ করেছিলেন।

এই নীতি অবলম্বনের উপকারিতা

১। শরয়ী নিয়ম-নীতি অবলম্বন করলে এমন পরিকল্পনা হতে মুসলিম দূরে থাকতে পারে, যা হতে শরীয়ত তাকে বাধ দান করে, গর্হিত কল্পনা ও ইচ্ছা থেকে রক্ষা করে এবং তার ধ্যান ও ধারণা সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত থাকে। পক্ষান্তরে সে যদি কোন নীতির অনুসরণ ব্যতিরেকেই কোন সমস্যা নিয়ে বিচার-বিবেচনা শুরু করে, তাহলে তার আত্মা, পরিবার, সমাজ বা জাতির ক্ষেত্রে প্রত্যেক আচরণে তার জ্ঞান ও বিবেক বিক্ষিপ্ত হবে। অথচ এই নীতির সাহায্য নিলে সর্বক্ষেত্রে সে বিশৃঙ্খলার হাত থেকে রেহাই পাবে।

২। এই নীতিমালার অনুসরণ করলে মুসলিম ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে পরিত্রাণ পাবে। কারণ, যদি সে সর্বদা এবং বিশেষ করে ফিতনার সময় নিজের রায় ও মন মত চলে, প্রত্যেক সমস্যার সমাধান যদি নিজ জ্ঞান ও বিবেক মত করে এবং আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের নীতি-নৈতিকতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের বাহ্য দৃষ্টিতেই ফিতনাকে দেখে থাকে, তাহলে নিশ্চয় সে ভ্রান্তির ছোবল থেকে মুক্তি

পাবে না। আর ভ্রান্তির পরিণতি অবশ্যই নিন্দনীয়। যেহেতু আহলে সুন্নাহ এই নীতিমালা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে নির্ধারণ করেছেন। আর যা পাকা দলীল দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে তাতে ভুল হতে পারে না। পলা বাহুল্য যে দলীলের অনুগমন করবে এবং আহলে সুন্নাহর অনুসরণ করবে সে অবশ্যই কোন দিন লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হবে না।

৩। এই বিধি-নিয়মের অনুবর্তী হলে মুসলিম পাপের স্পর্শ থেকেও নিষ্কৃতি পায়। কেননা, নিজের খেয়াল-খুশী কিছু বললে ও করলে এবং তা নির্ভুল ও সঠিক জানলে -বিশেষ করে ফিতনার সময় তার পদস্খলন ঘটতে পারে।পক্ষান্তরে ঐ নীতি অনুসারে নিজেকে পরিচালনা করলে সে ভয় থাকে না এবং আল্লাহর অনুগ্রহে সে অব্যাহতি পায়। আবার দলীলের অনুগামী হওয়ার পরও যদি কোন ভুল থেকে যায়, তাহলে আল্লাহ পাক তা মার্জনা করেন। আর তার কাজই হল সর্বোত্তম, যে পাক্কা দলীলকে ভিত্তি করে কাজ করে।

বলাই বাহুল্য যে, যে সকল নীতি আমরা উল্লেখ করব তা শরয়ী দলীল থেকেই গৃহীত হয়েছে; কুরআন অথবা সুন্নাহ থেকে। আর যা আহলে সুন্নাহর উলামাগণ সলফদের জ্ঞানের আলোকে তা গ্রহণ করে নির্ধারণ করেছেন। অথবা রসূল ﷺ-এর সাহাবাগণের আদর্শ ও জীবন-চরিত থেকে তা নেওয়া হয়েছে। যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম ﷺ, তাবেঈনে এযাম (রঃ) এবং আহলে সুন্নাহ অলজামাআতের ইমামগণের জীবনে ফিতনার সময় আমাদের জন্য সুন্দর আদর্শ ও নমুনা রয়েছে। কালের বিবর্তনের সাথে সাথে তাঁরা সেই অনুসরণীয় আদর্শ প্রদর্শন করে গেছেন। পাকা দলীল হতে সংগ্রহ করে তাঁরা ফিতনার সময় নিজেদের জীবনে বহাল করে কর্মে পরিণত করেছেন।

অতএব আমাদের দৃষ্টি বক্র হওয়া উচিত নয়। উচিত নয় আমাদের বিবেক ভ্রষ্ট হওয়া। যদি আমরা সেই মধু ব্যবহার করি, যে মধু তাঁরা কিতাব ও সুন্নাহর ফুল থেকে আহরণ করেছেন, তাঁরা শক্ত দলীলকে ভিত্তি করে আমল করেছেন এবং

সকলের জন্য তাঁদের কর্মজীবনে বড় আদর্শ রেখে গেছেন আমরা যদি তা গ্রহণ ও বরণ করি, তাহলে অবশ্যই ভ্রষ্ট হব না।

আমাদের প্রতি মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ এই যে, তিনি যে কাজের ভার আমাদের উপর অর্পণ করেছেন, সে কাজের জন্য আমাদের অনুসরণীয় ও আদর্শ ব্যক্তিও পাঠিয়েছেন। আহলে সুন্নাহর উলামাগণ আমাদের অনুসরণীয়। তাঁদের জ্ঞান, সমঝ, রায়, অভিমত ও নির্দেশ অনুসরণ করে চলা আমাদের একান্ত কর্তব্য। যেহেতু তাঁদের পথ প্রদর্শনের আলো হচ্ছে একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ।

অতএব প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী -বিশেষ করে ফিতনার সময়- এই পুস্তিকায় উল্লেখিত সমস্ত নীতিমালার অনুসরণ করা। উক্ত কায়দা ও কানুন অনুপাতে নিজের জীবন পরিচালনা করা। আর যে ব্যক্তি কোন সুপথপ্রাপ্তের অনুগমন করে, দলীলের নির্দেশ মত কর্মে প্রয়াসী হয়, তবে তার জন্য সুসংবাদ, তার ঐ পথপ্রাপ্তির জন্য সুখবর; সে ঐ পথে চলে কোন দিন অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে না।

প্রথম নীতি ঃ
নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা

ফিতনার সময় মুসলিমকে যে প্রথম নীতির অনুসরণ করতে হয়, তা হল নম্রতা ও ধৈর্যশীলতা।

এটি একটি বড় গুরুত্বপূর্ণ নীতি। প্রথমতঃ মুসলিমের উচিত তার সর্বকাজে নম্রতা

প্রকাশ করে বিনয়ী হওয়া। মহানবী ﷺ বলেন, "নম্রতা যে জিনিসেই আসে, সে জিনিসকেই তা সৌন্দর্যমন্ডিত করে এবং যে জিনিস থেকে তা বিচ্ছিন্ন হয়, সে জিনিসকে তা সৌন্দর্যহীন করে ফেলে।" *(আহমাদ, মুসলিম, সহীহুল জামে' ৫৬৫৪নং)*

তিনি আরো বলেন, "অবশ্য আল্লাহ সকল কর্মে নম্রতা পছন্দ করেন।" *(বুখারী, সহীহুল জামে' ১৮৮১নং)*

সুতরাং মুসলিম কোন কাজে ক্রোধ, ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রকাশ করবে না। সে তার সর্বকাজে; তার চিন্তা ও গবেষণায়, রায় ও অভিমত ব্যক্ত করাতে, মতবিরোধের সময় কোন পক্ষ অবলম্বনে, কারো প্রতি কোন মন্তব্য প্রকাশে, সকল আচরণ ও ব্যবহারে সর্বদা বিনয়ী থাকবে। সৌন্দর্যমন্ডিত সকল কর্ম ও বস্তু গ্রহণ করে সৌন্দর্যহীন সকল কর্ম ও বস্তু বর্জন করবে। সদা যত্নবান হবে, যাতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেয়ে তার বক্তব্য এবং অশিষ্টতা প্রকাশ পেয়ে তার লেখনী সৌন্দর্যহীন মলিন না হয়ে যায়।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম প্রত্যেক কাজে ধীরতা অবলম্বন করবে। প্রিয় নবী ﷺ আশাজ্জ্ আব্দুল কইসকে বলেছিলেন, "অবশ্যই তোমার মধ্যে এমন একটি স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল পছন্দ করেন; সহনশীলতা ও ধীরতা।"

ধীরতা এক প্রশংসার্হ আচরণ। যার জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, মানুষ যেভাবে কল্যাণ প্রার্থনা করে, সেভাবেই অকল্যাণ প্রার্থনা (ক্রোধের সময় নিজের আত্মা ও সন্তানাদির উপর বদ্দুআ) করে। আর মানুষ বড় ত্বরা-প্রবণ। *(সূরা ইসরা' ১১ আয়াত)*

আহলে ইলমগণ বলেন, উক্ত আয়াতে অধীর মানুষের নিন্দা করা হয়েছে। কারণ, এই অধীরতার স্বভাব যার মধ্যে থাকে সে বহু কাজে -বিশেষ করে অসহিষ্ণুতা ও জলদিবাজীর সাথে করার পর- লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়। যার জন্যই মহানবী ﷺ ছিলেন ধীর ও শান্ত মানুষ।

কিছু মানুষ আছে, যাদের মধ্যে ধৈর্যশক্তি বলতে কিছুই নেই। তাই তারা কোনও বিষয়ে কিছু শুনলে তাদের বিবেক আর তিষ্ঠিতে পারে না। চোখ বুজে তা নিয়ে সত্বর

বিচার করে চট্‌পট্ মন্তব্য করে বসে। যেখানে অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী মানুষ সে বিষয়ের উপর বহু বিবেক-বিবেচনা ও ভাবনা চিন্তা করেও কোন মন্তব্য প্রকাশ করতে ভয় করেন। ধীর, সুস্থ ও শান্ত মনে বুঝে এবং কোন প্রকারের তড়িঘড়ি না করে কোন রায় প্রদান করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এঁরা কোন দিন লজ্জিত ও অপমানিত হন না। কোন বিষয়ের উপর বিচারে জলদিবাজী না করে তাঁরা তাঁদের প্রত্যেক কাজে সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব বজায় রাখেন। ফিতনার ঝড়ে প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই বেঁচে যান। পক্ষান্তরে যাঁরা ত্বরা করে পক্ষাবলম্বন করেন, তাঁরাই ঈমান ও জীবন নিয়ে হালাক হয়ে যান।

তৃতীয়তঃ মুসলিম প্রত্যেক কর্মে সহনশীলতা ধারণ করে। বিপদ ও ফিতনার সময় সহ্য করলে তার ফল বড় মিঠা হয়। সহনশীলতার সাথে বস্তু ও পরিস্থিতির প্রকৃতত্ব ও যথার্থতা লক্ষ্য করা যায় এবং তারপর কোন একটা অনুকূল ব্যবস্থা খুঁজে বের করা সহজসাধ্য হয়।

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে বর্ণিত যে, একদা হযরত আম্র বিন আস ﷺ-এর সামনে হযরত মুস্তাওরিদ কুরাশী বললেন, আমি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "কিয়ামত সংঘটিত হবার সময় রোমান (ইউরোপীয়)দের সংখ্যা বেশী হবে।" হযরত আম্র ﷺ মুস্তাওরিদকে বললেন, 'কি বলছেন খেয়াল করে দেখুন!' তিনি বললেন, 'আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেছেন, তা বলতে আমার বাধা কিসের?'

তখন হযরত আম্র ﷺ বললেন, 'যদি তা সত্য হয়, তাহলে তা রোমানদের ৪টি স্বভাব-গুণের কারণে হবে। প্রথমতঃ ফিতনার সময়ে সকল মানুষের চেয়ে ওরাই বেশী সহ্যশীল। দ্বিতীয়তঃ বিপদের পর ওরাই অধিক শীঘ্র নিজেদেরকে সামলে নিতে পারে। আর এইভাবে ৪টি স্বভাব তিনি উল্লেখ করলেন এবং আরো একটি অধিক বললেন। *(মুসলিম ২৮৯৮-নং)*

উলামাগণ বলেন, হযরত আম্র বিন আসের উক্ত কথার উদ্দেশ্য কাফের নাসারা রোমানদের প্রশংসা করা নয়। বরং তাঁর উদ্দেশ্য মুসলিমদেরকে এই কথা জানানো যে, কিয়ামত অবধি তারা অবশিষ্ট থাকবে এবং তারাই সংখ্যাগুরু হবে। আর তার কারণ, তারা ফিতনার সময় সকলের চেয়ে অধিক সহ্য করে থাকে। সহনশীলতার

সাথে পরিস্থিতির গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং অনুকূল ও প্রতিকূল নির্ণয় করে অনুকূলের পক্ষ অবলম্বন করে। যাতে তাদের জান-মালের কোন ক্ষতি না হয়।

এখানে ঐ সূক্ষ্ম সতর্কতাটি প্রণিধানযোগ্য। প্রিয় নবী ﷺ-এর উক্তির কারণ দর্শিয়ে সাহাবী আম্‌র বলেন, তা তাদের ৪টি গুণের ফল। তার মধ্যে সহনশীলতা অন্যতম। অবস্থা ও কালের যখন বিপর্যয় আসে, ফিতনার করাল গ্রাস যখন সকলকে নাশ করতে চায়, তখন তারা ধৈর্য ও সহ্যের সাথে তার সম্মুখীন হয়। তারা কোন বিষয়ে ত্বরা করে না এবং ক্রোধ বা ঔদ্ধত্য প্রকাশও করে না। যাতে শান্ত ও গম্ভীরভাবে আত্মরক্ষা করতে পারে। এমন রাজনীতি প্রয়োগ করে, যাতে সাপও মরে এবং লাঠিও ভাঙ্গে না। আর অনেক সময় কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার কাজ করে। যার ফলে তারা কিয়ামত পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতার সহিত অবশিষ্ট থাকবে। অথচ বিস্ময়ের বিষয় যে, উক্ত নীতি মুসলিমরা গ্রহণ করে না, যার তা'রীফ হযরত আম্‌র ؓ করেছেন। উপরন্তু সবার চেয়ে মুসলিমরাই প্রত্যেক উৎকর্ষ ও মঙ্গলের অধিকারী বেশী।

এ ছিল প্রথম নীতি, যা আহলে সুন্নাহর উলামাগণ ফিতনার সময় প্রয়োগ করেছেন এবং করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

দ্বিতীয় নীতি ঃ
জেনে মন্তব্য করা

কালের যখন বিবর্তন আসে, ফিতনার যখন প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তখন মুসলিমের উচিত, তার সর্বদিক নিয়ে ভাবনা-চিন্তা না করে ও তার ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা না এনে তার সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন মন্তব্য প্রকাশ না করা। যেহেতু ফিকহী সূত্র হল, 'কোন বিষয়ের উপর মন্তব্য তা কল্পনা করার শাখা।' অর্থাৎ আগে বিষয়ীভূত বস্তু সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা না জন্মানো পর্যন্ত তার উপর কোন মন্তব্য পেশ করা যাবে না।

এটি এমন একটি নীতি, যা সর্ব যুগে সকল জ্ঞানী-গুণীজনই পালন করে চলেন। যার শরয়ী দলীল মহান আল্লাহর এই বাণী,

([illegible])

অর্থাৎ, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে অনুমান দ্বারা পরিচালিত হয়ো না। *(সূরা ইসরা' ৩৬ আয়াত)*

অর্থাৎ, যে বিষয় তুমি জান না, যে সম্পর্কে তোমার কোন ধারণাই নেই বা যা তুমি কল্পনা করতে পার না, সে বিষয়ে আন্দাজে ও অনুমানে কোন কথা বলার জন্য মুখ খুলো না; সে বিষয়ে কোন নিষ্পত্তিদাতা, নেতা বা অনুসরণীয় ব্যক্তি হওয়া তো দূরের কথা।

প্রায় সকল মানুষই উক্ত নীতিকথা সাধারণ কাজ ও আচরণে স্মরণ রেখে চলে। কারণ, বিবেক ঐ নীতির অনুসরণ ব্যতিরেকে বিভিন্ন কঠিন পরিস্থিতির সমস্যার সমাধান খুঁজতে অপারঙ্গম হয়। তাকে কি করা বা বলা অথবা কোন পথে চলা উচিত তা নির্ণয় করতে বিভ্রান্তি ঘটে।

এ বিষয়ে মা'মুলী ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আশা করি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে। মনে করুন, একজন লম্পট একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি যদি নিজের গাছে নিজের মানুষ করা ফল ভোগ করি, তাহলে তাতে গোনাহ আছে কি?'

মওলানা সাহেব চোখ বুজে বললেন, 'না, না। তাতে আবার গোনাহ কিসের? নিজের তৈরী গাছ নিজের ফল। তা ভোগ করা তো অবশ্যই বৈধ।'

কিন্তু তিনি এই মাসআলাটি প্রশ্নকারীর নিকট থেকে সঠিক ধারণা ও কল্পনা না করেই তাঁর নিজ ধারণা মতে চট্ করে উত্তর দিয়ে ভুল করলেন। কারণ, ঐ ফতোয়ায় লম্পট তার ঔরসজাত কন্যাকে হালাল করে ব্যবহার করবে! নাঊযু বিল্লাহি মিন যালিক।

মনে করুন, একজন জিজ্ঞাসা করল, 'ওস্তাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করা, তাঁর

খিদমত করা ইত্যাদি কি শরীয়তে নিষিদ্ধ?'

মওলানা বললেন, 'অবশ্যই না।' কিন্তু এই প্রশ্নেও জিজ্ঞাসিত বিষয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার ফলে উত্তর ভুল হয়ে গেল। কারণ প্রশ্নকারী এই উত্তরে তথাকথিত 'পীর ধরা' জায়েয ভেবে শির্কের পর্যায়ভুক্ত কাজ শুরু করে দেবে।

একজন প্রশ্ন করল, 'হুযুর! ফরয নামাযের পর দুআ করা কি?' চট্ করে হুযুর বললেন, 'সুন্নত। আল্লাহর নবী ﷺ ফরয নামাযের পর যিক্র ও দুআ করতেন।' অথচ প্রশ্নকারী এই উত্তর থেকে ফরয নামাযের পর হাত তুলে জামাআতী মুনাজাতকে বিধেয় মনে করে বসল।

তদনুরূপ কেউ কোন জামাআত বা দল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলে অনেকে নিজের সাধারণ জ্ঞান ও ধারণা মত উত্তর দিয়ে থাকে। যেমন যদি প্রশ্ন হয়, 'শিয়া কি?' বা 'রেডক্রশ বা এন-জি-ও কি?' উত্তরে অনেকে বলে থাকে, 'শিয়া নবীর বংশধর বা তাঁদের অনুগামী জামাআত, রেডক্রশ বা এন-জি-ও এক একটি মানব-দরদী সংস্থা, যে সব সংস্থা অবহেলিত মানুষ বিশেষ করে গরীবদের বড় সহায়তা করে থাকে। ইত্যাদি। অথচ এ উত্তর যে সঠিক নয়, বা এ উত্তরে যে বিপর্যয় সৃষ্টি হয়, তা উত্তরদাতার ধারণায় থাকে না; যেমন তার ধারণায় থাকে না জিজ্ঞাসিত বিষয়ের সঠিক জ্ঞান। ফলে আন্দাজে বক মারতে বকরী মেরে বসে থাকে। অথচ যে বিষয়ে পূর্ণ ধারণা ও জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে শরয়ী সমাধান দেওয়া বা মন্তব্য করা নিতান্ত অনুচিত ও অবৈধ। কেননা, যদি জানা না থাকে, সে জামাআত বা দল কি? তার মূল নীতি কি? তার উদ্দেশ্য কি? তার আসল রূপ কি? তা ইসলাম ও আহলে সুন্নাহর পরিপন্থী কি না? তাহলে তার সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য করা সত্যই বিপজ্জনক ও ফিতনার কারণ।

এ কথা স্পষ্ট হলে জানা দরকার যে, কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান ও ধারণা না জন্মানো পর্যন্ত কোন কাজী, বিচারক, মুফতী বা আলেমের জন্য শরয়ী কোন সমস্যার সমাধান দানের উদ্দেশ্যে মুখ খোলা আদৌ উচিত নয়। তাতে তিনি নিজে

নিরাপত্তা পাবেন, পদস্খলন ও পাপ থেকে বাঁচতে পারবেন, মুসলিমদের হক ও অধিকার যথার্থরূপে সুরক্ষিত হবে এবং বিনা ইলমে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করা থেকে দূরে থাকতে পারবেন।

বলা বাহুল্য, দু'টি বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে পারলে তিনি মুখ খুলতে পারেন;

প্রথমতঃ তিনি উপস্থাপিত সমস্যার সঠিক ধারণা মনে গেঁথে নেবেন। খেয়াল রাখবেন, যাতে প্রায় অনুরূপ ভিন্ন কোন সমস্যা বর্তমান সমস্যার সাথে তালগোল না খেয়ে যায়। এক মাসআলা বুঝতে অন্য মাসআলার সদৃশ ধারণা মনে স্থান পেয়ে না যায়। যেহেতু এমন অনেক মাসায়েল আছে, যা শুনতে ও বুঝতে প্রায় এক লাগলেও পারিপার্শ্বিকতা অনুযায়ী তার মান ও সমাধান ভিন্ন হয়। তাই এ বিষয়ে খেয়াল না রাখলে সমাধান দিতে ভ্রমে পড়তে হয়।

দ্বিতীয়তঃ অবিকল ঐ সমস্যায় আল্লাহ ও তদীয় রসূলের সমাধান কি তা জানবেন। অন্য কোন সদৃশ সমস্যার সমাধান জানা যথেষ্ট নয়।

এ কথা জানার পর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আসে। অনেকে বলতে পারেন, 'উপস্থাপিত সমস্যার সঠিক ধারণা আমার কি উপায়ে জন্মাতে পারে? কিভাবে আমি মাসআলার সঠিক কল্পনা করতে সক্ষম হব? কার নিকট থেকে আমি আমার ধারণা স্পষ্ট করব? কারণ, সমস্যাবলী এক অপরের প্রায় অনুরূপ। কিছু মাসায়েল সত্যই দুরূহ এবং কিছুর সঠিক ধারণা আনার জন্য অবশ্যই অন্যের সহযোগিতা চাই, কিন্তু সে সহযোগিতা মিলে না।'

এ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, শরয়ী হুক্ম বা মন্তব্য ও অভিমত গ্রহণের ক্ষেত্রে উপস্থিত সমস্যার সঠিক ধারণা দু'টি উপায়ে সহজ হতে পারে ঃ-

১। উপস্থাপক বা প্রশ্নকারীর নিকট হতে সরাসরি জেনে। কারণ, সমস্যা পেশকারীই সমস্যার আসল পরিস্থিতি জানে। সমাধানদাতা যদি সমস্যার বিষয়ে তাকে বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদ বা জেরা করেন এবং সে যদি সঠিক পরিস্থিতি হতে তার উত্তর দিয়ে থাকে, তাহলে ধারণা জন্মানো খুব সহজ। আর তখন সেই অনুপাতে তার সমাধান বা উত্তর দেওয়া খুব সঠিকভাবে সম্ভব হয়।

২। আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত মুসলিমদের বর্ণনার মাধ্যমে; যে মুসলিমদের বর্ণনায় কোন প্রকারের সন্দেহ থাকে না, কোন প্রকার দুষ্কৃতি মনোভাব অথবা ভুলের আশঙ্কা থাকে না।

এরূপ না হলে কোন বিষয়ে মন্তব্য করতে বা কোন সমস্যার সমাধান দিতে অবশ্যই ভুল হবে। আর সে ভুলের জন্য আক্ষেপও করতে হবে।

অতএব ফিতনার প্রাদুর্ভাব এবং পরিস্থিতির বিপর্যয়কালে কোন কাফের বা ফাসেকের কথায় কান দিয়ে এবং সেই কথার উপর ভিত্তি করে কোন বিষয়ের উপর কড়া মন্তব্য করা বা সত্বর সমাধান দিয়ে বসা মুসলিমের উচিত নয়। কোন কাফের বা ফাসেক-পরিচালিত সংবাদ মাধ্যম, রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা বা অন্যান্য প্রচার-মাধ্যমের খবর, টীকা-টিপ্পনী ও প্রতিবেদন-বিশ্লেষণ নিয়ে কোন সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা জম্মানো অথবা সে বিষয়ে কোন সমাধান গ্রহণ অবশ্যই ভ্রষ্টতা।

আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ বলেন,

[illegible]

([illegible])

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসেক তোমাদের নিকট কোন বার্তা আনয়ন করে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ; যাতে অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে আঘাত না করে বস এবং পরে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত না হও। *(সূরা হুজুরাত ৬ আয়াত)*

বলা বাহুল্য কাফের ও ফাসেকের সংবাদকে ভিত্তি করে শরীয়তে কোন সমাধানই বৈধ নয়। কোন শরয়ী সমাধান, অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশ কেবলমাত্র বিশ্বস্ত মুসলিম প্রচার-মাধ্যমে প্রচারিত সংবাদকে ভিত্তি করে বৈধ হতে পারে। কারণ, যারা ইসলাম ও প্রকৃত মুসলিমের দুশমন, তারা তো তাই প্রচার করে থাকে, যাতে মুসলিমের লাঞ্ছনা আছে। যে খবরে ইসলাম ও মুসলিমের সুখ্যাতি ও সুনাম আছে, তা তারা প্রচার করে না। বরং যাতে তার কুখ্যাতি, কুৎসা ও বদনাম আছে তাই ফলাও করে

প্রচার করতে ও রটাতে তারা খুশী হয়। অতএব যারা ইসলাম ও দ্বীনদার মুসলিমের নামে নাক সিঁটকায়, তাদের কোন ইসলাম বা মুসলিম বিষয়ক রটিত খবরে আমরা বিশ্বাস করে লাফিয়ে বেড়াব কেন? অথবা তাদের সুরে সুর মিলিয়ে আমাদেরকে নিজেদেরকে কলঙ্কিত ও বদনাম করব কেন? জ্ঞানী তো সেই ব্যক্তি যে 'পুঁই' শুনতে 'রুই' শোনে না এবং 'চিলে কান নিয়ে গেল' শুনলে আগে নিজের কানে হাত দিয়ে দেখে সত্যাসত্যের বিচার করে। প্রথমে কানে হাত দিয়ে না দেখে অযথা চিলের পিছনে দৌড় দেয় না।

এতো সাধারণ খবরের কথা। বিশিষ্ট কোন সংবাদেও মুসলিম আস্থা রাখে না। রসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস যার-তার নিকট হতে গ্রহণ করা হয় না। হাদীসের বর্ণনা-সূত্রে যদি বিশ্বস্ত ও ভাল লোক না থাকেন, যিনি অনুরূপ অপর ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ণনা করে থাকেন; আর এইভাবে প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত রেজাল-সূত্র শক্ত হলে তবেই গ্রহণযোগ্য হয়। অন্যথা সে সূত্রে যদি কোন ফাসেক, অনির্ভরযোগ্য বা স্মৃতিশক্তিতে দুর্বল ইত্যাদি ব্যক্তি থাকে, তাহলে তা অবশ্যই গ্রহণ করা হয় না, বিধায় ঐ হাদীস দ্বারা কোন শরয়ী সমাধান গৃহীত হয় না।

সুতরাং 'জেনে মন্তব্য করা' -এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে খুব যত্নের সাথে স্মরণে রাখা মুসলিমের কর্তব্য।

ফিতনার সময় অবলম্বনীয় তৃতীয় নীতি হল, ন্যায়পরায়ণতা ও ইনসাফ।

মহান আল্লাহ বলেন,

(" [illegible])

অর্থাৎ, যখন তোমরা (কোন বিষয়ে কথা বলবে, তখন স্বজনের বিরুদ্ধে হলেও ন্যায্য বলবে। *(সূরা আনআম ১৫২ আয়াত)*

তিনি ন্যায়-নীতি সম্পর্কে আরো বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনও সুবিচার না করাতে প্ররোচিত না করে। সুবিচার কর, এটা তাকওয়ার (আত্মসংযমের) নিকটতর এবং আল্লাহকে ভয় কর। *(সূরা মাইদাহ ৮ আয়াত)*

শরীয়তে এ বিষয়ের উপর অনেকানেক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। ন্যায়পরায়ণতা যে সর্ব কাজে, কথায় ও অভিমত তথা মন্তব্য প্রকাশে জরুরী তাতে সতর্ক করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি তার কথায় ন্যায্যতা ব্যবহার করে না এবং কারো বা কোন কিছুর উপর অভিমত ও মন্তব্য প্রকাশে ইনসাফের খেয়াল রাখে না, আসলে সে ব্যক্তি শরীয়তের এমন অনুসরণ করে না, যার দ্বারা পরিত্রাণের আশা করা যায়।

কিন্তু এই নীতিতে ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার ব্যাখা কি?

ব্যাখ্যা এই যে, মুসলিম কোন ব্যক্তি বা জামাআতের উপর মন্তব্য করার সময় তার ভালো ও মন্দ উভয় দিক সামনে রাখবে। ভালো কি ও তার পরিমাণ কত এবং মন্দ কি ও তার পরিমাণ কত তা নিয়ে সমীক্ষা করবে। আর এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে তুলনা করে ইনসাফের সাথে কোন মন্তব্য ও অভিমত ব্যক্ত করবে। যাতে মুসলিম শরীয়তের প্রতি অথবা মহান আল্লাহর কোন সৃষ্টির প্রতি এমন কথা আরোপ করা থেকে বাঁচতে পারে, যা আল্লাহর প্রত্যাদেশের অনুকূল নয়।

বলা বাহুল্য, ভালো-মন্দ উভয় দিককেই সামনে রেখে সুস্থ বিবেকের ন্যায্য নিক্তিতে নিরপেক্ষভাবে বিষয়বস্তুকে ওজন করতে হবে। এতে ন্যায়সঙ্গত কোন শরয়ী পরিণতিতে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে এবং ফিতনার সময় কল্পনা ও ধারণা, কথা ও বিবেক পবিত্রভাবে কোন কিছুর প্রতি মন্তব্য ও পক্ষগ্রহণ করবে।

আর ইন শাআল্লাহ তা হবে ফিতনা থেকে সফল পরিত্রাতা।

প্রকৃতপক্ষে ন্যায়পরায়ণতা একটি মহৎ গুণ ও গুরুত্বপূর্ণ নীতি, যা প্রত্যেক মুসলিমের মাঝে বর্তমান থাকা উচিত। কেউ সে নীতি উল্লংঘন করলে অবশ্যই তার মনে কুপ্রবৃত্তির অনুপ্রবেশ ঘটবে এবং অপরের মনেও কুপ্রবৃত্তির দ্বার উদ্‌ঘাটন করার আশঙ্কা থাকবে। আর এইভাবে নিজের গোনাহর ভার ও অপরের গোনাহর ভার তাকে বহন করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

([illegible])

অর্থাৎ, নিশ্চয় কিয়ামতের দিন ওরা পূর্ণমাত্রায় বহন করবে ওদের পাপভার এবং তাদের পাপভারও ওরা বহন করবে, যাদেরকে বিনা ইলমে (কোন ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে) বিভ্রান্ত করে থাকে। দেখ, ওরা যা বহন করবে তা কত নিকৃষ্ট! *(সূরা নাহল ২৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মন্দ রীতি প্রচলিত করবে, তার উপর তার নিজের পাপ এবং কিয়ামত অবধি ঐ রীতির অনুসারীদের পাপ বর্তাবে।" *(মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৩০৫-৬৩০৬নং)*

পক্ষান্তরে মহাবিপদ হবে তখনই, যখন ন্যায়পরায়ণতার এই নীতি ও গুণ কোন বড় আলেমের মাঝে থাকবে না। যেহেতু বড় আলেমের কথা ও কাজে নীম আলেম ও জাহেলরা অনুকরণ করে থাকে।

বলা বাহুল্য, উক্ত নীতির কথা নির্বিশেষে সকলকে স্মরণে রাখা উচিত। যাতে প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়ে আমরা কোন বিষয়ে বাড়াবাড়ি না করে বসি। কারণ, যে ব্যক্তি প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা থেকে নিরাপদে থাকে সে ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা ও নিষ্কৃতি লাভ করবে।

চতুর্থ নীতি ঃ ঐক্য ও সংহতি

ফিতনার সময় মান্য চতুর্থ নীতি একতা। অবশ্য মুসলিমের জন্য একতা ও সংহতি সর্বাবস্থায় জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে (দ্বীন ও কুরআনকে) সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না। *(সূরা আ-লে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বাস কর এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থেকো।" *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৭নং)*

তিনি বলেন, "জামাআত (ঐক্য) হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আযাব।" *(মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৫, সহীহুল জামে' ৩১০৯নং)*

রায় ও অভিমত প্রকাশে, কথা ও কাজে বরং সর্বপ্রকার বিচ্ছিন্নতা মাত্রই আযাব। মহান আল্লাহ সেই আযাব দ্বারা তাদেরকে শায়েস্তা করেন, যারা তাঁর অনুশাসনের বিরোধিতা করে এবং তাঁর নির্দেশিত পথে চল বাদ দিয়ে অন্য কোন পথে চলতে সাহস করে।

অতএব যে ব্যক্তি আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের মত ও পথ অবলম্বন করে - যা প্রকৃতপক্ষে কিতাব ও সুন্নাহর পথ- এবং ঐ জামাআতের ইমাম ও উলামাগণের আনুগত্য ও অনুসরণ করে চলে, সেই জামাআতবদ্ধভাবে বাস করে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তাঁদের নিকট হতে দূরে থাকতে চায়, তাঁদের বিরুদ্ধে কোন প্রকারের দুরভিসন্ধি, কোন প্রকারের অসমীচীন মন্তব্য করে তাঁদের প্রতি কটাক্ষ হানে এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তাঁদের সমালোচনা করে, সে ব্যক্তি সম্পর্কে সংশয় হয় যে, সে

বিচ্ছিন্নতার পথে চলে। আর মহান আল্লাহ তাকে পার্থিব জীবনের কোন প্রকার আযাবের স্বাদ গ্রহণ করাবেন।

হ্যাঁ, 'ঐক্য এক আশিস এবং বিচ্ছিন্নতা এ সাজা ও বিপদ।' যাবতীয় প্রকারের একতা ও মিলন যদি সত্য, ন্যায় এবং কিতাব ও সুন্নাহর নির্দেশের ভিত্তিতে হয়, তাহলে তা নিশ্চয়ই এক আশিস, যার দ্বারা আল্লাহ জাল্লা অআলা বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। আর অনৈক্য ও অমিলন -যা সাধারণতঃ বাতিল পথে সৃষ্টি হয়ে থাকে তা- আল্লাহর এক প্রকার আযাব। যার মধ্যে অবশ্যই কোন মঙ্গল নেই।

এ জন্যই মহান আল্লাহ যেখানে বলেছেন, "তোমরা সকলে (মিলিতভাবে) আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ো না" -সেখানেই তার পরে পরে তিনি বলেছেন, "আর তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে বাধা দান করবে; আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম।" অতঃপর বলেছেন, "আর তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।" *(সূরা আ-লে ইমরান ১০৪-১০৫ আয়াত)*

হ্যাঁ, স্পষ্ট নিদর্শন এবং সৎ ও সত্য পথের আলোকবর্তিকা আসার পরেও যারা তাদের কথা ও কাজে ভিন্নতা ও অনৈক্য প্রদর্শন করে, তাদের নিকট হতে বক্রতা, কুটিলতা ও বিচ্ছিন্নতারই আশঙ্কা হয়। তারা হেদায়াতের আলোকিত পথ ত্যাগ করে ফাসাদ, বিঘ্ন ও ধ্বংসের পথ অবলম্বন করে।

তাই তো মুসলিমের জন্য একান্ত জরুরী আহলে সুন্নাহর (সালাফী) জামাআতে শামিল হওয়া, তাঁদের কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ ভিত্তিক অভিমত ও কথার অনুসরণ করা, তাঁদের নিয়ম-নীতির অনুগামী হওয়া, তাঁদের জীবন-পদ্ধতি হতে বিপথগামী না হওয়া, তাঁদের উলামাগণকে খুঁজে বের করে তাঁদের নিকটেই ইল্‌ম গ্রহণ করা। কারণ, তাঁরা আহলে সুন্নাহর মৌলিক নীতিমালা জানেন এবং তার শরয়ী দলীলও চেনেন। আর তাঁরা যা জানেন, অন্যরা তা জানে না। লম্বা-চওড়া উপাধি ও ডিগ্রি

থাকলেও ভিতর তাদের খালি থাকে। পক্ষান্তরে তাঁরা সুগভীর ইল্‌ম ও পান্ডিত্য, সুচিন্তিত মত ও নির্দেশের অধিকারী।

যে বিষয় ও বিরোধ নিয়ে সম্মিলিত জামাআত ও উম্মতের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও ফাসাদ সৃষ্টি হয়, আহলে সুন্নাহ সে রকম বিষয়কে প্রকাশ ও প্রচার করেন না। বরং সেই সময় বড় হিকমত ও সুকৌশলের সাথে কাজ নেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান ﷺ-এর সাথে হজ্জ-সফরে মক্কা শরীফে ছিলেন। মিনায় অবস্থানকালে হযরত উসমান ﷺ কসর না করে পুরো ৪ রাকআত নামায পড়াতেন। অথচ সুন্নাহ হল, হাজী সেখানে কসর করে (যথাসময়ে যোহর, আসর ও এশার) নামায ২ রাকআত করে পড়বে। কিন্তু তিনি কোন শরয়ী তা'বীল (তাৎপর্যের) ভিত্তিতেই কসর না করে নামায পুরো করেই পড়তেন। (যাতে মরুবাসী সাধারণ জাহেলরা মনে না করে যে, ঐ নামাযগুলি সব সময়ের জন্য ২ রাকআত করেই ফরয।) হযরত ইবনে মাসঊদ ﷺ বলতেন, 'মুস্তাফা ﷺ -এর সুন্নাহ, প্রত্যেক ৪ রাকআত বিশিষ্ট নামায মিনায় অবস্থানকালে ২ রাকআত করেই পড়া। একদা তাঁকে বলা হল, 'হে আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ! আপনি এ কথা বলছেন, অথচ আপনি নিজেই উসমান বিন আফ্‌ফানের পশ্চাতে ৪ রাকআত পড়েন, তা কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'ওহে! বিরোধিতা করা মন্দ জিনিস। মতভেদ করা খারাপ জিনিস।' *(আবূ দাউদ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/৪৪৪)*

তাঁদের এইরূপ আচরণ ছিল। কারণ, তাঁরা সঠিক ও ন্যায্য নীতির বাহক ও অনুসারী ছিলেন। যারা তাঁদের ঐ নীতির বিরোধী, যারা আস্ফালন করে বীরত্বের ও হিম্মতের পরিচয় দিয়ে অযথা জিব লড়াতে যায়, তারা অবশ্যই নিজেদের এবং আরো অন্যান্যদের উপর ফিতনা ডেকে আনে। যেমন নদীর বাঁধের ইঁদুর বাঁধের গায়ে গর্ত করে নিজের উপর তথা বাঁধের নিচে বসবাসকারী আরো অন্যান্যের উপর বন্যার বিপদ ডেকে আনে। (অবশ্য ফিতনার ভয় না থাকলে এবং নির্ধারিত সীমা লংঘন না হলে ন্যায্য বলা এক কর্তব্য। আবার সংগ্রাম শাসকগোষ্ঠীর কুফরীর

বিরুদ্ধে হলে তার কথাও ভিন্ন।)
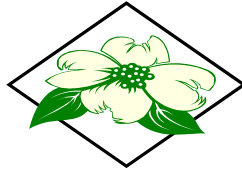
ন্যায়-অন্যায় নির্ণয় করার জন্য, হক ও বাতিলের সঠিক পরিমাপ ওজন করার জন্য মুসলিমের একমাত্র নিক্তি হচ্ছে, নির্ভেজাল শরীয়ত-নিক্তি, আহলে সুন্নাহর তুলাদন্ড। ফিতনার সময়ও সত্যানুসারী রাষ্ট্রনেতা অথবা আল্লাহর পথে আহবানকারী উলামাদের পতাকা চিহ্নিত করে তার পক্ষ অবলম্বন করার জন্যও মুসলিমের ঐ একই নিক্তি ব্যবহার করা কর্তব্য। যে নিক্তিতে ঘটনা-প্রবাহ ওজন করলে সূক্ষ্ম ও সঠিক মাপ ধরা পড়বে। প্রত্যেকের অংশ হবে ন্যায্য ও সঠিক পরিমাণের। যেমন মহান আল্লাহ তাঁর নিজের নিক্তি প্রসঙ্গে বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় বিচারের মানদন্ড স্থাপন করব। সুতরাং কারো প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। *(সূরা আম্বিয়া ৪৭ আয়াত)*

আহলে সুন্নাহর এমন ন্যায্য নিক্তি ও কষ্টিপাথর আছে, যার দ্বারা তাঁরা যাবতীয় কর্মাকর্ম, মতবাদ, পরিস্থিতি ও কালের বিপর্যয়ে পারিপার্শ্বিক সকল অবস্থাকে ওজন করে হক-নাহক চিহ্নিত করে থাকেন।

তাঁদের ঐ নিক্তি বা কষ্টিপাথর হল দুই প্রকার; প্রথমতঃ সেই নিক্তি ও কষ্টিপাথর যার দ্বারা ইসলামকে অনৈসলাম থেকে পৃথক ও চিহ্নিত করা যায়। যে মুসলিম বলে দাবী করে, তার দাবীর সত্যতা পরখ করা যায়।

ইসলামের নামে আজ যে সব পতাকা উড্ডীয়মান, তা অবশ্যই অগণিত। ইসলামের লেবেল ও মার্কা মেরে কত মত ও পথের পণ্যদ্রব্যের বিপণন ঘটেছে ভবের (তাহরীক, বিপ্লব ও আন্দোলনের) বাজারে তার ইয়ত্তা নেই। তাই তো মুসলিম ধোকা খেয়ে যায় ঐ বাজারে পড়ে। কিন্তু যদি তার নিকট ঐ নিক্তি বা কষ্টিপাথর থাকে, তাহলে নিশ্চয় সে ধোকা খাওয়া থেকে বাঁচতে পারে। বরং ন্যায় ও সত্যানুসারী পতাকা বা মার্কা নির্ণীত করে তার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের উদাত্ত আহবানে অকপটে সারা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ সেই নিক্তি বা কষ্টিপাথর যার দ্বারা ইসলামে পূর্ণতা থেকে অপূর্ণতা ও তার কমিকে ওজন ও যাচাই করা যায়। কেউ ইসলামের উপর পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়পদ আছে কি না -তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

অতএব প্রথম নিক্তি বা কষ্টিপাথর দ্বারা কুফ্‌র ও ঈমানের পার্থক্য নিরূপণ করা যায়; বুঝা যায় যে, সে উড্ডীয়মান পতাকা ঈমানের অথবা কুফরের।

আর দ্বিতীয় নিক্তি বা কষ্টিপাথর দ্বারা বুঝতে পারা যায় যে, উত্তোলিত পতাকা প্রকৃত ও পূর্ণ ইসলামের হেদায়াত ও নির্দেশের ভিত্তিতে উড্ডীয়মান; যেমন আল্লাহ ও রসূল পছন্দ করেন। অথবা তার ইসলাম ও ঈমানে কিছু বা অনেকটা কমি

আছে?

প্রথম প্রকারের নিক্তি বা কষ্টিপাথরে ওজন বা পরখ করার পদ্ধতি আবার ৩ প্রকার;

১। লক্ষণীয় যে, সেই পতাকাধারীরা আল্লাহ ও তদীয় রসূল তথা সমগ্র ইসলামের উপর যথার্থ প্রত্যয় রাখে কি না? সকল প্রকারের ইবাদত (প্রার্থনা, নযর, কুরবানী ইত্যাদি) একমাত্র আল্লাহর জন্য নিবেদন করে কি না? যেহেতু আল্লাহ জাল্লা শা'নুহ সকল আম্বিয়া ও রসূলগণকে এই ভিত্তি ও মূল নীতির উপর প্রেরিত করেছেন যে, ([illegible]) আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। এই তাওহীদই দ্বীনের মূল বুনিয়াদ, প্রথম ও শেষ। অতএব যারা তাওহীদের নিশানা বহন ও স্থাপন করে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করে এবং কোন গায়রুল্লাহর ইবাদত করে না, তাদেরই পতাকা ইসলামের পতাকা বলে ঐ নিক্তি বা কষ্টিপাথর দ্বারা বুঝা যাবে।

মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, (এক) আল্লাহর উপাসনা কর এবং তোমাদের পূজ্যমান গায়রুল্লাহ সমূহকে বর্জন কর -এই নির্দেশ দিয়ে আমি অবশ্যই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

অন্যত্র বলেন,

[illegible]

([illegible])

অর্থাৎ, আল্লাহ নিশ্চয় তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে (দ্বীনকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয় শক্তিমান, পরাক্রমশালী। যাদেরকে আমি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা (রাজত্ব) দান করলে তারা যথাযথভাবে নামায আদায় করে, যাকাত প্রদান করে, সৎকার্যের

নির্দেশ দেয় এবং অসৎকার্যে বাধা দান করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। *(সূরা হাজ্জ ৪১ আয়াত)*

কিছু মুফাসসেরীন বলেন, 'সৎকার্যের নির্দেশ দেয়' অর্থাৎ তাওহীদের আদেশ দেয়। আর 'অসৎকার্যে বাধা দান করে' অর্থাৎ, শির্কী কর্মে বাধা দান করে। কারণ সর্বোৎকৃষ্ট সৎকার্য হল 'তাওহীদ' এবং নিকৃষ্টতম অসৎকার্য হল শির্ক।

অতএব এই প্রকার সদ্‌গুণ উক্ত নিক্তি বা কষ্টিপাথরে সঠিক ও সহজভাবে ধরা পড়ে। ফল ইতিবাচক হলে সে উড্ডীয়মান পতাকা মুসলিমের।

২। দ্রষ্টব্য যে, ([illegible]) 'মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল' -এই সাক্ষ্যের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করে কি না? যার দাবী হচ্ছে, তিনি যে ধর্মীয় অনুশাসন আনয়ন করেছেন তার উপর ভিত্তি করে রাজ্য শাসন, বিচার-মীমাংসা করে কি না? তাঁর শরীয়তকে পতাকাধারীরা তাদের জীবন-ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় আইন বলে মানে কি না?

মহান আল্লাহ বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, কিন্তু না, (হে নবী) তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মু'মিন হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন প্রকার দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

তিনি অন্যত্র বলেন,

([illegible])

অর্থাৎ, তবে কি তারা জাহেলিয়াত (প্রাগ্‌-ইসলামী মূর্খ) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে? *(সূরা মাইদাহ ৫০ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ([illegible])

অর্থাৎ, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। *(সূরা মাইদাহ ৪৪ আয়াত)*

অতএব যদি দেখা যায় যে, উত্তোলিত পতাকার অনুসারীরা মহানবী ﷺ-এর আনীত শরীয়ত দ্বারা বিচার-মীমাংসা করে, জনসাধারণের আপোসের দ্বন্দ্ব-কলহের বিচার-নিষ্পত্তি তাদের শরয়ী কাযী করে থাকেন, তাহলে জানা যাবে যে, ঐ পতাকা মুসলিমের। কেননা, আল্লাহ-প্রদত্ত জীবন-ব্যবস্থা অনুযায়ী তারা নিজেদের জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালিত করে। শরয়ী আদালত বা বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করে। মানুষের মনগড়া রচিত আইন ও বিধান দ্বারা বিচার করতে না কাউকে আদেশ করে এবং না-ই মানব-রচিত কানুন অনুযায়ী ফায়সালায় তারা সন্তুষ্ট হয়। যেখানে না কোন ইসলামী আন্দোলন, বিপ্লব বা সংগঠনের প্রয়োজন, আর না-ই কোন মানবাধিকার রক্ষার জন্য কোন ভিন্ন সংস্থা। কারণ সকল প্রকার মানবিক অধিকার আদায় যেমন ইসলাম করে, তেমন কোন সংস্থা, সমিতি বা সংগঠন করতে আদৌ সক্ষম নয়।

৩। দেখতে হবে যে, ঐ পতাকাধারীদের কেউ কি কোনও হারাম বস্তুকে হালাল মনে করে অথবা হারাম কাজ করা হলে তার প্রতি ঘৃণা ও নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ ও জারী করা হয় কি?

কারণ (সর্ববাদিসম্মত) হারাম বস্তু প্রকাশকালে দুই অবস্থা হতে পারে; যদি তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে বা অবজ্ঞা করে তাকে হালাল ও বৈধ মনে করা হয়, তাহলে তা কুফরী। (অর্থাৎ, যদি ঐ পতাকাধারীদের কেউ কোন হারাম বস্তু; যেমন সূদ, ব্যভিচার ইত্যাদিকে হালাল মনে করে, তাহলে সে কাফের।) আর ঐ পতাকা কাফেরদের।

কিন্তু হারাম বস্তু যদি হালাল মনে না করা হয়, যা ঐ পতাকা তলে পাওয়া যায় (যেমন, গান-বাজনা, সূদী ব্যাংক ইত্যাদি) এবং পতাকাধারীরা স্বীকার করে যে, তা হারাম ও পরিত্যাজ্য এবং সেখানে তা বর্জন করার নির্দেশ ও উপদেশ জারী থাকে, তাহলে তা কুফরী নয়। বরং জানতে হবে যে ঐ পতাকা (দুর্বল ঈমানের)

মুসলিমদের।

দ্বিতীয় প্রকার নিক্তি বা কষ্টিপাথর, যার দ্বারা ইসলাম ও ঈমানের পূর্ণতা অথবা অপূর্ণতা নির্ণয় করা যায় ঃ-

আল্লাহর প্রেরিত দূত প্রিয় নবী ﷺ ছিলেন পূর্ণ ইসলাম ও ঈমানের এক ভাস্বর রবি। তিনি সকলের অনুসরণীয় অনুকরণীয়। তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ করে তাঁর সাহাবাবৃন্দ পূর্ণ ইসলামকে সাদরে গ্রহণ ও পালন করেছিলেন। তাঁরা (বিশেষ করে খুলাফায়ে রাশেদীন) ছিলেন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গসুন্দর মুসলিম ও মু'মিনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁদের পর হতেই শুরু করে অদ্যাবধি কিছু না কিছু করে ইসলামের পূর্ণেন্দু ক্ষয় ও লয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে। এ জগতে এমন কোন মানুষ নেই যার চরিতাকাশে ইসলাম ও ঈমানের জ্যোতিষ্মান পূর্ণেন্দু শোভমান।

মুস্তাফা ﷺ বলেন, "মানুষের মাঝে যে যুগ আসবে তার চেয়ে তার পরবর্তী যুগ হবে অধিকতর মন্দ। আর এইভাবে মন্দ হতে হতে প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাতের সময় এসে উপস্থিত হয়ে পড়বে।" *(আহমাদ, বুখারী, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৭৫৭৬নং)*

মুসলিম এই নিক্তি বা কষ্টিপাথরে লক্ষ্য করবে, পতাকাধারীরা কি পরিমাণে শরীয়ত পালন করছে? নামায ও অন্যান্য ফরয কাজে কতটা তাকীদ করছে? কি পরিমাণে তারা ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করছে?

যদি এ সব কাজে যথার্থতা লক্ষ্য করে, তাহলে জানবে, ইসলামী পরিপূর্ণতা তাদের নিকটে। আর যদি তাতে অযাথার্থ্য লক্ষ্য করে, তাহলে জানবে, তাদের নিকট পূর্ণ ইসলাম নেই। তা বলে তারা কাফের নয়।

বলা বাহুল্য মুসলিমের জন্য উক্ত প্রকার নিক্তি ও কষ্টিপাথরসমূহ অতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তু। যেগুলিকে সর্বদা মন ও জ্ঞানের মণিকোঠায় ধারণ ও স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে ভ্রষ্টতার উপগমনে পদস্খলন না ঘটে এবং বিভিন্ন প্রচার আহবানের ঘুরপাকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পরিশেষে ভ্রান্ত পথে পদার্পণ না হয়।

এই উক্ত প্রকার বিচার ও বিবেকের মাধ্যমে মুসলিম যখন স্পষ্ট ন্যায় ও সত্যকে

নির্ণয় করতে পারবে এবং হকপন্থীদের সঠিক পতাকা নির্বাচন করতে পারবে, তখন তার জন্য ঐ ন্যায়, সত্য ও হকের সহিত সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব গড়া ওয়াজেব হয়ে যাবে। যেহেতু বিশ্বাধিপতি মহান আল্লাহ আমাদেরকে মু'মিনদের সহিত বন্ধুত্ব ও অন্তরঙ্গতা গড়তে আদেশ করেছেন। একতাবদ্ধ হয়ে তাঁর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা হতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তাই প্রথমতঃ মুসলিমের উচিত ঐ পতাকাধারীদের সাথে যথার্থ বন্ধুত্ব গড়ে তোলা; যে পতাকা প্রকৃত ইসলামের নামে উত্তোলিত হয়। যাতে কোন প্রকারের বক্রতা, কোন রকমের সংশয়, কোন ধরনের দু'টানাটানি ও বিকর্ষণ নেই। এইরূপ ইসলামী কেতন জানার পর কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়, তার ঐ পতাকার পক্ষ অবলম্বন না করা, তার সাহায্য ও সহযোগিতা না করা, তার ছায়াতলে আশ্রয়গ্রহণ-কারীদের সাথে অন্তরঙ্গতা স্থাপন না করে দূরে সরে যাওয়া।

দ্বিতীয়তঃ তার উচিত, ঐ পক্ষে শামিল হয়ে যথাসাধ্য তার হিতসাধন করার চেষ্টা করা। বিভিন্ন হিতোপদেশ দান করা।

আহলে সুন্নাহ অলজামাআহ নিজের রাজকর্তৃপক্ষকে গোপনে নসীহত করে, তাদের জন্য হেদায়াত ও সুপথপ্রাপ্তির দুআ করে। (কুফরী ছাড়া) কোন প্রকারের পাপ লক্ষ্য করলে বিচ্ছিন্নতাবাদী খাওয়ারেজদের মত বিদ্রোহ ঘোষণা না করে, প্রকাশ্যে কোন বিক্ষোভ বা সন্ত্রাস প্রদর্শন না করে, জনসাধারণকে তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত না করে গোপনে ঠান্ডাভাবে কল্যাণ ও শান্তি আনতে চায়। যাতে রক্তক্ষয়ী ফিতনা শুরু হয়ে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া থেকে বাঁচা যায়।

যাঁরা আহলে সুন্নাহর বই-পুস্তক পড়াশোনা করেন, তাঁরা অবশ্যই অবহিত যে, আহলে সুন্নাহর নিকটে প্রজাদের উপর রাজার প্রাপ্য অধিকার কি এবং রাজার উপর প্রজাদের প্রাপ্য অধিকার কি? যে অধিকার আহলে সুন্নাহর উলামাগণ সাব্যস্ত করেছেন তা আদায় হলে ঐক্য লাভ হয় এবং প্রকৃত সুন্নাহর প্লাটফর্মে 'জামাআত'

প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

মহানবী ﷺ উম্মতকে তাদের ইমাম (নেতা) ও জনসাধারণের জন্য হিতাকাঙ্খী হতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য পরস্পরকে হিতোপদেশ দান করা ওয়াজেব; যা তাকে করতেই হবে। কিন্তু উক্ত নসীহত বা হিতোপদেশ দান করার পদ্ধতি কি? ইমাম, রাজা বা আমীরকে কোন উপায়ে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তির উপর সতর্ক করে সত্য পথের সন্ধান দেওয়া যাবে?

এর উত্তরে দু'জাহানের রাজা রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাজকর্তৃপক্ষকে হিতোপদেশ দান করার ইচ্ছা করে, সে যেন প্রকাশ্যে তা না করে; বরং তার হাত ধরে নির্জনে (উপদেশ দান করে)। সে যদি তার নিকট হতে (ঐ উপদেশ) গ্রহণ করে নেয় তো উত্তম। নচেৎ নিজের দায়িত্ব সে যথার্থ পালন করে থাকে।" *(সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম)*

অতএব এর পর আর কোন কর্তব্য (কোন অনৈসলামী পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক পদ্ধতি, যেমন প্রকাশ্যে জনসমক্ষে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ-মিছিল, ধর্মঘট অথবা বিদ্রোহ ঘোষণা ইত্যাদি) অবশিষ্ট থাকে না, যতক্ষণ না স্পষ্ট কুফরী প্রকাশিত হয় এবং তার উপর হুজ্জত ও দলীল উপস্থাপিত করা হয়। ([1])

([1]) *সেকুলার (ধর্মহীন) রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীন সরকারের পতন ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র রচনার করার উদ্দেশ্যে কোন মুসলিম-প্রধান দেশে ধর্মঘট ইত্যাদি করা বৈধ কি না, সে বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন সাহেব জিজ্ঞাসিত হলে উত্তরে তিনি বলেন, মুসলিম যুবসম্প্রদায়কে সঠিক নির্দেশনা দান করার ব্যাপারে এ প্রশ্নের বিপজ্জনক প্রভাব রয়েছে। যেহেতু ধর্মঘট চাহে প্রাইভেট কাজকর্মে হোক অথবা সরকারী কাজকর্মে -শরীয়তে এর বুনিয়াদ গড়ার মত ভিত্তি নেই। আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রয়োজন ও ব্যাপকতার দিক দিয়ে ধর্মঘটের পরিধি ও পরিসর অনুযায়ী তাতে বহু ক্ষতি ও অপকারিতা নিহিত রয়েছে। আবার এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, ধর্মঘট সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার এক অভিনব পন্থা। প্রশ্নে বলা হয়েছে, ধর্মঘটের উদ্দেশ্য হল, ধর্মহীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মূলোৎপাটন ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য ওয়াজেব যে, প্রথমতঃ ঐ শাসন-ব্যবস্থা যে ধর্মহীন তা আমরা প্রমাণ করব। তারপর যদি তা প্রমাণিত হয়, তাহলেও জ্ঞাতব্য যে, কোন ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ করা কয়েকটি শর্ত পূরণ ব্যতীত বৈধ নয়।*

যেমন মহানবী ﷺ তার বর্ণনা দিয়েছেন; উবাদাহ বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, "তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী হতে দেখ, যাতে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে কোন দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।"

সুতরাং বিদ্রোহ ঘোষণা করার মূলতঃ ৫টি শর্ত রয়েছে ঃ-

১। প্রকাশ্য কুফরী পরিদৃষ্ট হবে অথবা সুনিশ্চিতভাবে এ কথা জানা যাবে যে, সরকার কুফরীতে আলিপ্ত হয়েছে।

২। সরকার যে পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে তা কুফরী হতে হবে। ফাসেকী হলে হবে না, তাতে সে ফাসেকী যত বড়ই হোক না কেন, তা দেখে বিদ্রোহ বৈধ হবে না।

৩। সেই কুফরী প্রকাশ্যে সকলের গোচরে অনুষ্ঠিত হবে, যার কোন ভিন্ন উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না।

৪। তার উপর কিতাব, (সহীহ) সুন্নাহ বা উম্মতের ইজমা' (সর্ববাদিসম্মতি) থেকে অকাট্য যুক্তি ও দলীল বর্তমান থাকতে হবে।

উক্ত ৪টি শর্ত মহানবী ﷺ-এর জবানী বর্ণনা।

৫। পঞ্চম শর্তটি ইসলামের সাধারণ মৌলনীতি থেকে গৃহীত। আর তা এই যে, ঐ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার মত বিদ্রোহীদের প্রকৃতই শক্তি ও সামর্থ্য থাকতে হবে। যেহেতু তাদের যদি সে শক্তি না থাকে, তাহলে এর প্রতিক্রিয়া তাদের স্বার্থের প্রতিকূল হবে। যাতে ঐ শাসন-ব্যবস্থার উপর -দ্বীনে-ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবী উত্থাপনকারী অন্যান্য জামাআত শক্তিশালী হয়ে না ওঠা পর্যন্ত- চুপ থাকার ক্ষতির অপেক্ষা অধিকতর বৃহৎ ক্ষতি পরিলক্ষিত হবে।

বলা বাহুল্য কোনও মুসলিম-প্রধান দেশে ধর্মহীন রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে সর্বাগ্রে উক্ত ৫টি শর্ত পূরণ হওয়া জরুরী। তারপর যখন এ কথা সুনিশ্চিত হবে যে, ধর্মঘট, হরতালাদি ঐ সরকারের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার অথবা ঐ শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার কারণ হিসাবে পরে দেখা দেবে, তখন (ঐ শর্তাবলী পূরণ হওয়ার পর) তা করতে বাধা নেই।

পক্ষান্তরে উল্লেখিত ঐ ৫টি শর্তের কোন একটি অপূরণ থাকলে ধর্মঘট এবং বর্তমান সরকারকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে কোন প্রকার বিপ্লব সংঘটন বৈধ হবে না।

উক্ত উদ্দেশ্যে ধর্মঘট ফল না দিলে জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে বিপ্লব আনার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হলে উত্তরে তিনি আরো বলেন, এই অবস্থায় জনগণকে উত্তেজিত করে বিদ্রোহ ঘোষণাকে আমি ভালো মনে করি না। যেহেতু জানা কথা যে, সরকারের হাতেই বৈষয়িক শক্তি থাকে। কিন্তু জনসাধারণের কাছে রান্নাঘরের ছুরি এবং রাখালের লাঠি ছাড়া সাধারণতঃ আর কিছু থাকে না। আর তা দিয়ে ট্যাংক্ প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রের মোকাবেলা করতে পারে না। অবশ্য পূর্বোক্ত শর্তাবলী পূরণ হলে বিদ্রোহের অন্য পথ আছে। তবে আমাদেরকে এ বিষয়ে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। কারণ যে দেশ বহু বহু বছর ধরে বিদেশী আগ্রাসন ও আধিপত্যের শিকার থেকেছে, সে দেশ সহসায় চট্ করে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে না। বরং সে আশা পূরণের জন্য আমাদেরকে দীর্ঘকাল যাবৎ ধৈর্য ধরে থাকতে হবে।

একটি লোক ভিত্তি স্থাপন করে প্রাসাদ গড়ে তোলে। সে তাতে বসবাস করুক অথবা বসবাস করার পূর্বেই দুনিয়া ত্যাগ করুক, তার উত্তরসূরীরা বাস করার সুযোগ লাভ অবশ্যই করে। আসল উদ্দেশ্য ইসলামী প্রাসাদ গড়ে উঠবে- যদিও সে বাসনা পূরণ হতে বহু বৎসর লেগে যাবে। তাই আমি মনে করি, এ বিষয়ে আমাদেরকে তাড়াহুড়া করা উচিত নয়। উচিত নয় এ উদ্দেশ্যে জনগণকে উত্তেজিত করে বিদ্রোহ ও জনবিস্ফোরণ ঘটানো। কারণ, সমস্যা বড় বিপজ্জনক এবং সকলের জানা আছে যে, গণ-বিক্ষোভের অধিকাংশই উচ্ছৃঙ্খলতা ও হাঙ্গামাপূর্ণ ব্যাপার; যা কোন নির্দিষ্ট কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে না। যদি সরকারী দমন-শক্তি মহল্লায় এসে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে ধ্বংস-লীলা চালায়, তাহলে দেখা যাবে যে, বাকী অন্যান্য মহল্লার লোকেরা নিজেদের পূর্বদাবী প্রত্যাহার করে নিয়েছে। (আসসাহওয়াতুল ইসলামিয়্যাহ ১৬৮-১৭০পৃঃ দ্রঃ)

সুতরাং যা প্রয়োজন তা হল, জনগণের চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিশুদ্ধি ও ইসলামী আদর্শভিত্তিক চরিত্র গঠন করা। জাহেলিয়াতি চিন্তাধারা এবং শির্ক ও বিদআতকে নির্মূল করা এবং ইসলামী সর্বাঙ্গ-সুন্দর সুখী জীবনের পূর্ণ পরিবেশ গড়ে তোলা। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অনুপ্রবেশকে চিরতরে প্রতিহত করা। সমাজের সাধারণ সংস্কার ও সংশোধন করে তরবিয়ত ও তা'লীমের মাধ্যমে এমন এক সমাজ গড়া, যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামী শাসনের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং তার জন্য দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। ইসলামী জীবন-ব্যবস্থার এমন পরিশীলন হতে থাকে, যাতে তার অনুশাসনের বিরোধী কেউ থাকলেও যেন কম থাকে। তবেই ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে। নচেৎ না।

বলা বাহুল্য, আমাদেরকে ততদিন অপেক্ষা করে ধৈর্য ধরতে হবে, যতদিন না ঐ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন না মরা ইঁদুরের গন্ধ দূর হয়েছে, ততদিন আতর ছড়ানোর জন্য এবং যতদিন না জমির আগাছা দূর হয়েছে ততদিন ফল-ফসলের বীজ ফেলার জন্য আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে। নচেৎ, মেহনত বরবাদ যাবে।

যদি আমরা সুন্নাহর এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় অবশ্যই ফিতনার ছোবল থেকে বেঁচে যাব এবং রক্তের অপচয় থেকে রক্ষা পাব। নচেৎ আহলে সুন্নাহর পথ হতে বের হয়ে অবশ্যই বিচ্ছিন্নতা ও ফাসাদের শিকার হয়ে যাব।

উপর্যুক্ত নিক্তি বা কষ্টিপাথরে কিছু ওজন করতে বা যাচতে যদি মুসলিমের মনে কোন প্রকার সংশয় সৃষ্টি বা তালগোল পাকার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহলে তার উচিত, সেই উলামাদের সহযোগিতা নেওয়া, যাঁরা সঠিক ওজন করতে বা যাচতে জানেন। আর আহলে সুন্নাহর (সালাফী) উলামা ছাড়া অন্য কোন উলামা অথবা শিক্ষিতদের কাছে সে নিক্তি বা কষ্টিপাথর নেই, সে ওজন-প্রণালীও নেই। কারণ, এঁরা কিছু জানলেও বহু কিছু তাঁদের অজানা অথবা অমান্য থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ইতর-বিশেষকে এমন একাকার করে দেন, যা আদৌ উচিত ও বৈধ নয়।

বলা বাহুল্য, উক্ত নিক্তি ও কষ্টিপাথরের প্রকৃত মালিক তাঁরা, যাঁরা কিতাব ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে সব কিছু পরিচালনা করেন। আর তাঁরাই হলেন আহলে সুন্নাহ বা সালাফী জামাআত।

উত্থাপিত বিষয়ের সুন্নী নীতি এই যে, প্রত্যেক ভালো ও মন্দ ইমামের সাথে মুসলিমের জন্য জিহাদ ফরয। অতএব (কাফের নয় এমন) ইমাম কিছু পাপ করে বলে, কিছু ধর্মীয় অনুশাসনকে মানতে পারে না বলে তাঁর পতাকাতল হতে সরে আসা অথবা জিহাদে তাঁর সঙ্গদান না করা মুসলিমের জন্য আদৌ বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে আহলে সুন্নাহর আর এক নীতি, মুসলিমদের রাষ্ট্রনেতা, আমীর ও বাদশার জন্য আন্তরিক দুআ করা। আহলে সুন্নাহর অন্যতম ইমাম বার্বাহারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ 'আস্-সুন্নাহ'তে বলেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে দেখ যে, সে (মুসলিম) রাজকর্তৃপক্ষের জন্য দুআ করছে, তাহলে জেনো যে, সে ব্যক্তি একজন আহলে সুন্নাহ। আর যদি কাউকে রাজকর্তৃপক্ষের উপর বদ্দুআ করতে দেখ, তাহলে জেনো যে, সে একজন আহলে বিদআহ।'

ফুযাইল বিন ইয়ায (রঃ) তাঁর সমসাময়িক রাজার জন্য অনেকানেক দুআ করতেন। অথচ তৎকালীন আব্বাসী শাসনামলের বাদশাহদের দুরবস্থার কথা কারো

অজানা নেই। তাঁদের সুমতি ও হেদায়াতের জন্য বেশীর ভাগ দুআ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনি নিজ অপেক্ষা বেশী ওঁদের জন্য দুআ করছেন কেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, কারণ যদি আমার সংশোধন আমার নিজের ও আমার পার্শ্ববর্তী মানুষ (পরিবারের) জন্য। কিন্তু বাদশার সংশোধন সারা মুসলিম জনসাধারণের জন্য সংশোধন।' (অর্থাৎ, বাদশা শুধরে গেলে প্রজারা অনায়াসে শুধরে যাবে।)

অতএব যে কেউ মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য মঙ্গল কামনা করে, তার উচিত, শাসকগোষ্ঠীকে গোপনে হিতোপদেশ দান করা, আন্তরিকতার সাথে তাঁদের জন্য আল্লাহর দরবারে দুআ করা; যাতে তিনি তাঁদেরকে সুপথ ও সুমতি দান করেন এবং কিতাব ও সুন্নাহর সংবিধান শরীয়ত প্রতিষ্ঠা করে তার উপর যথার্থরূপে আমল করেন। কিতাব ও সুন্নাহর উপর আমল হলে -মুসলিম এর চাইতে অধিক আর কি কামনা করতে পারে?
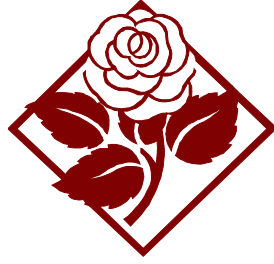
ফিতনার উপগমের সময় কথা ও কাজের সূক্ষ্ম নিয়ম আছে। অতএব প্রত্যেক সেই কথা, যা হক ও ভালো বলে মনে হয়, তাই সব সময় প্রকাশ্যে যে বলা যাবে তা নয়। তদ্রূপ প্রত্যেক সেই কাজ, যা করা উত্তম মনে হয়, তা সব সময় প্রকাশ্যে যে করা যাবে তাও নয়। ধরে নিন, আপনি কোন যুবক-যুবতীকে সত্যই ব্যভিচার করতে দেখলেন। কিন্তু সে কথা আপনি শাসকগোষ্ঠীর কাছে বা আর কারো কাছে বলতে পারেন না। কারণ, চার জন সাক্ষী উপস্থিত না করতে পারলে, উল্টে আপনাকেই ৮০ চাবুক খেতে হবে। বিশেষ করে ফিতনার সময় বক্তার বক্তব্যে এবং কর্তার কর্মে বহু হিতাহিত জড়িত থাকে। বরং এই সময় বিপত্তির আশঙ্কাই অধিক

থাকে। অতএব সে সময় বাক্‌সংযমশীলতা প্রয়োগ করা জ্ঞানীর কাজ। তাই তো আমরা হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ-কে বলতে শুনি, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে দু'টি (জ্ঞান) পাত্র সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু ওর দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত। *(বুখারী ১২০নং)*

আহলে ইলমগণ বলেন, হযরত আবূ হুরাইরা ﷺ ফিতনা ও বানী উমাইয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহকে প্রচার না করে গুপ্ত রেখেছিলেন। আর এ কথা তিনি তখন বলেছেন, যখন হযরত মুআবিয়া ﷺ মুসলিমদের রাজা। ভীষণ বড় ফিতনা ও সংঘর্ষের পর তাঁকে মেনে নিয়েই মুসলিমরা নিজেদের মাঝে ঐক্য আনয়ন করেছিল।

কিন্তু রসূল ﷺ-এর হাদীস তিনি গোপন করলেন কেন? যেহেতু সে সমস্ত হাদীস কোন শরয়ী আহকাম সংক্রান্ত ছিল না। বরং তা ছিল আগামীতে ঘটিতব্য ফিতনার এবং যাদের হাতে তা ঘটবে তাদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত ছিল। তিনি সে সব গোপন করলেন, যাতে মানুষের মাঝে আর এক ফিতনা বেধে না যায় এবং সে সব হাদীস প্রচার করার ফলে নিজেকে ও আরো সকলকে ফাসাদের মধ্যে নিপতিত না করেন। তখন তিনি এ কথা বলেন নি যে, 'হাদীসের কথা সত্য। সত্য, ন্যায় বা হক বলব তো ভয় কিসের?' এ কথা ভাবেননি যে, 'ইল্‌ম গোপন করা বৈধ নয়।' কারণ, সাহাবী আবূ হুরাইরা ﷺ এই কল্যাণনীতি জানতেন যে, ঐক্য ও সংহতি লাভের পর তাঁর ঐ হাদীস প্রচার বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করবে, যাতে কিছু লাভ করতে গিয়ে তার থেকে বেশী অনেক কিছু হারিয়ে যাবে।

সাহাবী ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, 'তুমি যদি কোন সম্প্রদায়কে এমন হাদীস বর্ণনা কর, যা তাদের জ্ঞান স্পর্শ করতে পারে না, তাহলে নিশ্চয় তা তাদের কিছু মানুষের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।'

বিশেষতঃ ফিতনা সম্পর্কে যে সব কথা বলা হয়, তার প্রত্যেকটিকে বহু মানুষ

তার ধারণায় সঠিকভাবে ধরতে পারে না। কথার আসল উদ্দেশ্যকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। পরন্তু সেই ভুল ধারণা ও বুঝের উপর ভিত্তি করে ভ্রান্ত কিছু বিশ্বাস তার মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। অথবা সেই বুনিয়াদে এমন কতক আচরণ করে বসে বা এমন কিছু কথা বলে বসে, যার পরিণাম মোটেই ভালো নয়।

যার জন্যই সলফে সালেহীন এই নীতির বড় অনুসারী ছিলেন। হযরত আনাস বিন মালেক ﷺ (অত্যাচারী রাজা) হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে "নবী ﷺ উরানার লোকদিগকে (হত্যার বদলে) হত্যা করেছিলেন ---" এই হাদীস যখন বর্ণনা করেন, তখন তা দেখে হাসান বাসরী (রঃ) অপছন্দ করেন এবং তিনি হযরত আনাস ﷺকে বলেন, 'আপনি হাজ্জাজকে এ হাদীস কেন বর্ণনা করেন? '

তাঁর এই অপছন্দের কারণ, হাজ্জাজ সামান্য বিষয়ে রক্তপাত ঘটাতে বা তুচ্ছ দোষে হত্যা করতে অভ্যাসী ছিল। তার উপর এই হাদীস শুনে সে নিজ স্বৈরাচারিতার বৈধতার দলীল মনে করে খামাখা আরো কোন মানুষের প্রাণবধ করতে পারে। তাই ঐ শ্রেণীর যালেমের নিকট এই ধরনের হাদীস গোপন করা জরুরী ছিল। যাতে করে সে এই মনে না করে যে, উক্ত হাদীস তার অপকর্মের সমর্থন করে, সে (হত্যাদি অত্যাচার) যা করে তা সঠিক এবং এই হাদীস তার দলীল। যদিও সত্যপক্ষে তা দলীল নয়। যেহেতু তার জ্ঞান ও বিবেক সুস্থ ছিল না, ফলে হাদীস যা বলে তার বিপরীত অথবা অন্যরূপ উপলব্ধি করাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

মোট কথা তাবেয়ী হাসান বাসরী (রঃ) হযরত আনাস ﷺকে তাঁর উক্ত হাদীস বর্ণনার উপর প্রতিবাদ জানালেন। অথচ তিনি একজন বড় সাহাবী। কিন্তু সত্যপ্রিয় সাহাবীর নিকট সে সত্য উজ্জ্বলরূপে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাই হাজ্জাজকে ঐ হাদীস বর্ণনার পর তিনি সত্যসত্যই লজ্জিত হয়েছিলেন।

হযরত হুযাইফা ﷺ বহু সংখ্যক ফিতনার হাদীস গুপ্ত রেখেছিলেন। কারণ তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন যে, এ সব হাদীস জানা মানুষের প্রয়োজন নেই। অথচ

তা প্রচার করলে ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে।

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রঃ)ও যে সব হাদীসে বিদ্রোহের কথা আছে, সে সব হাদীস বর্ণনা করতে অপছন্দ করতেন এবং তিনি তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থ থেকে ঐ ধরনের হাদীসকে মুছে দিতে আদেশ করেছিলেন। তিনি বলেন, ফিতনায় কোন মঙ্গল নেই এবং বিদ্রোহেও কোন কল্যাণ নেই।'

অনুরূপভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ)ও ফিতনার আশঙ্কায় হাদীস গোপন করাটাকেই হিতকর বলে মনে করেছেন।

পক্ষান্তরে 'স্পষ্ট কথায় কষ্ট কি' এ নীতি ফিতনার ভয় না থাকলে তবেই মান্য, নচেৎ না। তদনুরূপ 'যালেম রাজার কাছে হক কথা বলা শ্রেষ্ঠ জিহাদ' এ হাদীসও কেবল রাজার কাছেই সীমিত। যালেম রাজার যুলমের কথা গোপনে তাকে বলে নসীহত করা আহলে সুন্নাহর এক নীতি। কিন্তু তাঁর সেই যুলমের কথা জনসাধারণের কাছে বলে তাদেরকে উত্তেজিত করে বিদ্রোহের মত ফিতনা আনয়ন করা সালাফী নীতি নয়।

মোটের উপর কথা এই যে, ফিতনার সময় যা জানা যাবে, তাই বলা হবে, অথবা যা বলা হয়, তা সর্বাবস্থায় বলা যায়, অথবা 'যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং' -এ সব কোন যুক্তির কথা নয়। বরং বলার মুখেও লাগাম থাকা উচিত এবং লিখার কলমেও সীমাবদ্ধতা থাকা জরুরী। নচেৎ সে কাজ হবে পাগলের। কারণ, 'ছাগলে কি না খায়, আর পাগলে কি না বলে।' অতএব কিছু বলা ও লিখার আগে ভেবে দেখতে হবে যে, তার সে কথা তার পরিবেশ ও বর্তমান পরিস্থিতিতে কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং তার অভিমত ও মন্তব্য কোন ফিতনা ও ফাসাদ সৃষ্টি করবে কি না?

আমাদের সলফ ফিতনার সময় নিজেদের তথা মুসলিমদের শান্তি ও নিরাপত্তার কথা চিন্তা করতেন। তাই বহু কিছু জানা সত্ত্বেও চুপ থেকে গেছেন। যাতে তাঁদের ঈমান ও দ্বীন নিরাপদ থাকে এবং ঐ নিরাপদ অবস্থাতেই আল্লাহ আযযা অজাল্লার সহিত সাক্ষাৎ হয়।

হযরত সা'দ বিন আবী অক্কাস ﷺ-এর পুত্র যখন ফিতনার সময় পিতাকে কিছু একটা করতে বলেছিলেন, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'এই! তুমি কি চাচ্ছ যে, আমি ফিতনার মাথা হব? না না, আল্লাহর কসম!'

সুতরাং সা'দ ﷺ তাঁর পুত্রকে নিষেধ করলেন, যাতে তিনি নিজে কিংবা তিনি (পুত্র) ফিতনা সৃষ্টিকারী বা তার নেতা না হয়ে পড়েন। কোন কথা বা কাজ যা বলা বা করা উত্তম মনে করে তা বলে বা করে বসলে হয়তো বা তার পরিণাম মন্দ হবে, কোন নতুন ফিতনা শুরু হবে তাঁদের কথা বা কাজে, অথবা আরব্ধ ফিতনা ঐ কথা বা কাজের মাধ্যমে আরো ঘোরালো ও জোরালো হয়ে উঠবে। আর তখন মাথার যন্ত্রণা ভালো করতে গিয়ে হয়তো মাথাটাই কাটা যাবে। সুতরাং একটু যন্ত্রণা সহ্য করে নেওয়াই হল উত্তম কাজ।

ফিতনার আশঙ্কার সময় জ্ঞানীর উচিত, কিছু বলা বা করার পূর্বে সমীক্ষা করে দেখা। যাতে 'বাত ভালো করতে গিয়ে কুষ্ঠব্যাধি শুরু' না হয়ে যায়। 'ঘামাচি চুলকে ঘা' যেন না হয়ে বসে। 'সাপ মারতে গিয়ে ছিপ যেন ভেঙ্গে না বসে।' 'জল খেতে গিয়ে ঘটি যেন হারিয়ে না যায়।' 'কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বের' না হয়। মঙ্গল আনতে গিয়ে অমঙ্গল যাতে না আসে, অথবা অমঙ্গল দূর করতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় অমঙ্গল যাতে আত্মপ্রকাশ না করে তার খেয়াল রাখা অবশ্যই জ্ঞানীর কর্তব্য।

ফিতনার সময় মুসলিমের উচিত, পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে সঠিক শরয়ী কষ্টিপাথর দ্বারা যাচাই করে নেওয়া। যাতে ঐ সময় কোন প্রকারের পদস্খলন না ঘটে এবং ঈমান, ইজ্জত ও জান-মালের নিরাপত্তা লাভ করতে পারে।

মানুষের আচরণ ও কর্মে একটা নিয়ম-নীতি আছে, যা মানুষ মেনে চলতে বাধ্য হয়। অন্যথা তাকে ঠোকর খেতে হয়। সাধারণ সময়ে যে কথা বললে বা যে কাজ করলে প্রশংসা ও সুনামের অধিকারী হওয়া যায়, সেই কথা বা কাজই ফিতনার সময় বললে বা করলে যে প্রশংসার্হ হওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কারণ, হয়তো বা সে যা বলতে বা করতে চাচ্ছে তার বিপরীত অথবা ভিন্নরূপও কেউ বুঝতে পারে।

প্রিয় নবী ﷺ হযরত আয়েশা (রাঃ)কে বলেছিলেন, “ তোমার কওম যদি কুফরীর নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হত, তাহলে অবশ্যই আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ইবরাহীম ﷺ-এর ভিত্তি অনুসারে পুনর্নির্মাণ করতাম এবং তার জন্য দু'টি দরজা বানাতাম।” *(বুখারী ১২৬, মুসলিম ১৩৩৩নং, আহমাদ, নাসাঈ)*

তাঁর ইচ্ছা ছিল কা'বা শরীফকে ঐরূপে পুনর্নির্মাণ করা। কিন্তু তিনি কুফ্ফারে কুরাইশদের মধ্যে যারা এই মাত্র নতুন নতুন ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিল, তাদের ভুল বুঝার আশঙ্কা করলেন। ভাবলেন, যদি তিনি এই মুহূর্তে ঐ কাজ করেন, তাহলে হয়তো ওরা মনে করবে যে, তিনি সুখ্যাতি ও গর্ব চাচ্ছেন, অথবা তিনি তাদের ও হযরত ইবরাহীমের দ্বীনকে একেবারেই অমূলক ভাবছেন--- ইত্যাদি। তাই এই আশঙ্কায় কা'বা পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনা তিনি বাতিল করলেন।

উক্ত হাদীস শরীফটিকে কেন্দ্র করে ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ বাব (অনুচ্ছেদ) বেঁধেছেন। তিনি তাতে বলেছেন, 'বাবঃ যে ব্যক্তি -মানুষ না বুঝে অধিকতর ক্ষতি বা বিপত্তিতে পড়বে -এই আশঙ্কায় কিছু ইচ্ছাধীন কর্মকে ত্যাগ করে।'

অর্থাৎ, এমন ইচ্ছাধীন কাজ, যা আমি করতেও পারি না-ও করতে পারি, সেই কাজ আমি পরিত্যাগ করব এই ভয়ে যে, লোকে আমার ঐ কাজটিকে ভুল বুঝবে এবং তার প্রতিক্রিয়াতে এমন আচরণ করে বসবে, যার ক্ষতি আমার ঐ কাজে যা লাভ হত তার দ্বিগুণ হয়ে থাকবে। তাই যুক্তিযুক্ত এই যে, একগুণ লাভের জন্য দ্বিগুণ ক্ষতি স্বীকার না করা। বরং লাভ হোক আর নাই হোক, যাতে মোটেই ক্ষতি না হয়, তারই আপ্রাণ চেষ্টা করা।

অতএব জানা গেল যে, ফিতনার সময় প্রত্যেককে জ্ঞান ও বিবেক করা উচিত এবং ঐ বিষয়ক কোন কাজে ত্বরা প্রকাশ ও জলদিবাজী একেবারেই অনুচিত। যেখানে শরীয়ত আমাকে পা টিপে চলতে বলে, সেখানে আমার কি দরকার ইচ্ছা করে পিছল কেটে অথবা পায়ে 'রোলার স্কেট' লাগিয়ে দ্রুত গড়িয়ে প্রত্যেক

মজলিসে ফিতনা নিয়ে কথা বলা? আমি ঐ সময় যেটাকে সঠিক এবং যে পক্ষকে সত্যানুসারী বলে মনে করি, প্রত্যেক বৈঠকে তা ব্যক্ত করা আমার কি প্রয়োজন? কি নিশ্চয়তা আছে যে, আমি যেটা বলছি সেটাই নির্ভুল সঠিক?

আমার উচিত যে, যদি ফিতনার সময় আমার কোন মন্তব্য বা সিদ্ধান্ত থাকে, তাহলে তা আহলে সুন্নাহর উলামাগণের কাছে পেশ করব। যদি তাঁরা তা সঠিক মনে করে গ্রহণ করেন তবে উত্তম। নচেৎ আমি আমার কর্তব্য আদায় করে দিলাম। এরপর জনসাধারণকে আর আমার ঐ মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত করার কোন অর্থ হয় না। যেহেতু তা করলে ধূমায়মান ফিতনায় আমার কথার ফুৎকার পড়বে এবং দাউদাউ করে জ্বলে উঠে সব ছারখার করে ফেলবে। কোথাও বা মুশরিকদের জন্য দুআ হবে এবং তাওহীদবাদী মুসলিমদের জন্য বদ্দুআ! আবার কোথাও বা অন্ধ বিক্ষোভ-মিছিল বের হয়ে অনর্থক কিছু মানুষের প্রাণ যাবে।

সপ্তম নীতিঃ উলামার প্রতি আদব

আল্লাহ আযযা অজাল্ল্ আমাদেরকে মুমিনদের সহিত -বিশেষ করে উলামাদের সহিত- ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও অন্তরঙ্গতা রাখতে আদেশ করেছেন।

([illegible])

অর্থাৎ, মুমিন পুরুষ ও নারীগণ পরস্পর পরস্পরের মিত্র। *(সূরা তাওবাহ ৭১ আয়াত)*

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফরয যে, সে মুসলিমকে ভালোবাসবে, সময়ে-অসময়ে সর্বদা তার সহযোগিতা করবে, বিপদে-আপদে তার সমব্যথী হবে, তাকে নিয়ে কোন প্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করবে না এবং তার মান-সম্ভ্রম বিনষ্ট করবে না।

সুতরাং এই কর্তব্য যদি সাধারণ মুসলিমের প্রতি হয়, তাহলে তাঁদের প্রতি কি হওয়া উচিত, যাঁরা আল্লাহর শরীয়তের পৃষ্ঠপোষক, যাঁরা মানুষকে হারাম-হালালের জ্ঞান দান করে থাকেন, বাতিল পথ থেকে বাঁচিয়ে হক পথ প্রদর্শন করে থাকেন, যাঁরা শান্তিময় পরিবেশ, সুশৃঙ্খল সমাজ এবং উন্নত চরিত্র ও মানবতা সৃষ্টি করতে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন?

তাই সুধারণা ও উৎকৃষ্ট গঠনমূলক আলোচনার (যিকরে খায়র) সহিত কোন আলেমের প্রসঙ্গ অবতারণা ব্যতীত তাঁর সমালোচনা, গীবত, নিন্দা এবং দোষচর্চা করা মুসলিমের জন্য হারাম। যে মজলিস ও বৈঠকে আলেমদের কেবল দোষত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করা হয়, সে মজলিস ও বৈঠক অতি নিকৃষ্ট। যে ব্যক্তি আলেম-বিদ্বেষী, কেবল আলেমদের ত্রুটিই দেখতে পায়, অথবা এক আলেমের পদস্খলন নিয়ে সারা আলেম-সমাজ বা প্রকৃত আলেমদেরও বদনাম গায়, অথবা সম্মুখে বা পশ্চাতে আলেমের ইজ্জত ও সম্ভ্রমে তীর হানে, অথবা তাঁকে মৃত জেনে তাঁর মাংস খেতে কসুর করে না -তার জেনে রাখা উচিত যে, আলেমের মাংস বড় বিষাক্ত। যে খাবে সে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে উলামাগণও মানুষ; ফিরিশ্তা নন। তাঁদেরও পদস্খলন ও ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। যাঁর ভুল হবে, তাঁকে গভীর শ্রদ্ধা ও আদবের সহিত সতর্ক করা, সাধারণ মজলিসে সে ভুলের কথা চর্চা না করে এবং সারা আলেম-সমাজটাকেই ঐ একইরূপ না ভেবে সেই আলেমের সহিত যোগাযোগ করে ভুল ভাঙ্গা দরকার। নিজের মনমত ফতোয়া না পেলে তাঁর উপর রুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হওয়া উচিত নয়। আবার কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর ভিত্তি করে কোন আলেমের মর্যাদা লুটা বৈধ নয়। যেহেতু যা শোনা যায়, তার সবটা ঠিক হয় না। অনেকে পুঁই বলতে রুই শুনে প্রচার করে থাকে। অতএব দেখা দরকার, যা ঐ আলেম সম্পর্কে বলা হচ্ছে তা সত্য কি না? যে ত্রুটি তিনি করে ফেলেছেন, তা কেন করেছেন এবং তিনি তা স্বীকার করে তওবা করেন কি না? ইত্যাদি যদি বাচ-বিচারের পর তাঁর ত্রুটি সত্য হয় এবং তিনি তা স্বীকার করে তওবা না করেন, তাহলে তাঁর যোগ্য শাস্তি আছে। আর এর জন্য গোটা

আলেম-সমাজের বদনামের কিছু নেই। অবশ্য সর্বসাধারণকে স্মরণে রাখা উচিত যে, "মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (নির্বিচারে চোখ বুজে) তাই গেয়ে বেড়ায়।" *(মুসলিম, আবূ দাঊদ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৪৮০, ৪৪৮২নং)*

উলামা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ, ভক্তির আধার ও সম্মানের পাত্র। তাঁদের চেয়ে আমাদের বেশী সোদর ও দোসর কে হতে পারেন, যাঁরা আমাদেরকে ইহ-পরকালের সমূহ বিপদ ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে থাকেন। পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যুর পর আমরা তাদের ধন-সম্পদের মীরাস থেকে অংশ পাই। কিন্তু একজন আলেমের নিকট হতে এমন মীরাসের অংশ পাই, যা বহু মূল্য ব্যয় করলেও পাওয়া যায় না। তাঁদের নিকট থেকে যদি আমরা আত্মীয়তা ছিন্ন করি, তাহলে অমূল্য নবুঅতের মীরাস থেকে আমরা বঞ্চিত থেকে যাব।

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, প্রায় সব কিছুতেই ভেজাল ও নকল অনুপ্রবেশ করেছে। তাহলে আমরা কি সব আলেমকেই এক মান দেব? সে উলামা কারা, যাঁদেরকে আমরা শ্রদ্ধা ও অনুসরণ করব? তাঁরা কারা, যাঁদের নিকট থেকে আমরা সঠিক নবুঅতী মীরাসের অধিকারী হতে পারব? কাদের নিকট আমরা আমাদের শরয়ী সমস্যার সমাধান চাইব? তাঁদের গুণাবলী বা পরিচয় কি?

প্রথমতঃ তাঁরা সমসাময়িক কালে আহলে সুন্নাহ অল-জামাআতের ইমাম। তাওহীদ ও আকীদার অনুসৃত আমীরে জামাআত।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা শরীয়তের প্রায় সর্ববিষয় সম্পর্কে পোক্তা জ্ঞান রাখেন। সর্বপ্রকার ইলমে ফিক্হ জানেন। শরয়ী নিয়ম-নীতি ও মান্য মৌলনীতি তাঁদের নখদর্পণে। তাঁদের নিকট কোন প্রকার বিভ্রান্তি নেই। নেই তাঁদের কথায় পরস্পর-বিরোধিতা। তাঁদের এক বিষয় অন্য বিষয়ের সহিত তালগোল খেয়ে যায় না। তাঁদের নিকট কোন প্রকার অন্ধ পক্ষপাতিত্ব ও জাতীয়তাবাদ নেই। পক্ষপাতিত্ব করলেও কেবল কিতাব ও সহীহ সুন্নাহরই করে থাকেন। তাঁরা শরীয়তকে হেরফের করে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে মোটেই আগ্রহী নন। তাঁরা ইসলামকে যুগোপযোগী করে নয়, বরং যুগকেই ইসলামী ছাঁচে ঢেলে গড়ে তোলেন।

তাঁরা যুগের বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিও বুঝেন। যে পরিস্থিতি জানার উপর শরয়ী কোন মান ও মন্তব্য নির্ভর করে, শরয়ী কোন বিচার ও ফায়সালা যে পরিস্থিতির অন্যসাপেক্ষ, তা তাঁরা অবশ্যই জানেন। কারণ, পারিপার্শ্বিকতা না বুঝে যাঁরা কোন বিচার করেন, তাঁরা অবশ্যই বিভ্রান্তিতে পড়েন। অতএব এমন পরিস্থিতির খবর রাখা প্রত্যেক আলেমের জন্য জরুরী।

কিন্তু এমন কিছু অন্তঃসারশূন্য পরিস্থিতি ও পরিবেশ আছে, যা নিরর্থক সময় ব্যয় করে জেনে অনেকে আস্ফালন করে থাকে এবং নাক সিঁটকে বলে, 'মওলানারা (মোল্লারা?) যুগের পরিস্থিতি বুঝেন না।' অথচ শরয়ী সমাধানের জন্য অথবা সমাজে চলার জন্য তা জানা জরুরী নয়। তা না শুনলে-বুঝলেও শরয়ী বিচার ও ফায়সালায় কোন প্রভাব বা অসুবিধা দেখা দেয় না।

উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্ফুটিত হয়ে উঠবে। মনে করুন, একজন আলেম জিজ্ঞাসিত হলেন, 'অমুক দেশ বা রাষ্ট্র কাফের না মুসলিম?' এই প্রশ্নের উত্তর তিনি তখনই দিতে পারবেন, যখন তিনি ঐ রাষ্ট্রের পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন; সেখানে মুসলিমদের সংখ্যা কত? সেখানকার রাষ্ট্রীয়-সংবিধান কি? সেখানে সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা দান করার ব্যবস্থা সরকারীভাবে আছে কি না? সেখানে মহাপাপ ঘটে কি না? ঘটলে তার শরয়ী দন্ডবিধি বলবৎ করা হয় কি না? সেখানকার শাসকগোষ্ঠী পাপ দেখে চুপ থাকেন, কিন্তু ঐ পাপগুলিকে হালাল জানেন কি না? ইত্যাদি বিষয় জানলে ও বুঝলে তবে হয়তো তিনি শরয়ী মন্তব্য প্রকাশ করতে পারবেন। নচেৎ না।

তদনুরূপ যদি জিজ্ঞাসিত হন যে, প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন ইসলামী জামাআত ও সংগঠন সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি? সে সব জামাআতের অনুসারীরা হকপন্থী না বাতিলপন্থী?

এ প্রশ্নের উত্তরেও কোন আলেম কিছু বলতে পারেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই সব জামাআতের পরিস্থিতি ও পরিবেশ, বিশ্বাস ও মৌলনীতি, রায় ও মতামত, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং দাওয়াত-পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভ না করেছেন।

ইংরেজদের আমলে ভারতবর্ষের কিছু উলামা ইংরেজী ভাষা শিখা হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমানের উলামাগণ সে ফতোয়া আর দেন না। বরং অনেকে শিখা মুস্তাহাব বলেন। কিন্তু দু'টি অভিমতই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে প্রকাশ করা হয়েছে। তখন ফিরিঙ্গীরা ইংরেজীর মাধ্যমে মুসলিমদের মাঝে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করত, অনেকে প্রলুব্ধ হয়ে ঐ ভাষা শিখতে গিয়েই ইসলাম ত্যাগ করত। (অবশ্য এখনো অনেকে করছে। নামে মুসলিম থাকলেও আচরণে খ্রিষ্টান হয়ে যাচ্ছে।) তাই স্বধর্ম ত্যাগ করার ঐ অসীলা বা ছিদ্রপথ বন্ধ করার মানসে কাফেরদের ঐ ভাষাকেই হারাম করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিস্থিতির পরিবর্তন এলে এবং ইংরেজী শিখাতে ক্ষতির চেয়ে লাভের পরিমাণ অধিক পরিদৃষ্ট হলে ফতোয়াও প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

মোটকথা, জরুরী ধরনের পরিস্থিতির কথা আলেমকে অবশ্যই জানতে ও বুঝতে হয়। নচেৎ কোন শরয়ী রায় ও সিদ্ধান্ত দান করার সময় মারাত্মক ভুলে পড়তে হয়।

পক্ষান্তরে যে পরিস্থিতি ও পরিবেশ জানার উপর কোন শরয়ী অভিমত পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়, তা জানলেই কি, আর না জানলেই বা কি?

যেমন মুসলিম নারীদের জন্য পর্দা ওয়াজেব। পুরুষদের জন্য (কমসে কম এক মুঠি পরিমাণ লম্বা) দাড়ি রাখা ওয়াজেব। ইত্যাদি শরয়ী অভিমত ব্যক্ত করার সময় আলেমের জন্য যুগের পরিস্থিতি জানার প্রয়োজন কি? সূদ হারাম বলতে আবার যুগের অবস্থা দেখার কি দরকার? যুগোপযোগিতার কথা খেয়াল করে 'যেমন কলি তেমনি চলি' বললে দ্বীন থাকবে কেমন করে?

পক্ষান্তরে দ্বীন তো চিরন্তন। যা সর্বযুগ ও কালের জন্য উপযোগী। তাতে সে যুগ কমপিউটারের হোক অথবা রিবোর্ট-রকেটের, শীতল যুদ্ধের হোক অথবা তারকা যুদ্ধের।

অতএব স্থূলকথায়, যে পরিস্থিতি জানায় ও বুঝায় শরীয়তের উপকার সাধন হয় এবং অপকার ও ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সে পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ থাকা আলেমের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় 'আজেবাজের পিছে পড়ে আসল কাজে

ফাঁকি' দেওয়া আলেমের উচিত নয়। বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের অপপ্রচার, ইসলাম ও মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও দুরভিসন্ধি এবং তার গতিবিধি ও শেষ পরিস্থিতি বিষয়ক খবর কিছু মুসলিম বা আলেম জানলেই যথেষ্ট। সকল আলেমের জন্যই যে জানা ফরয, তা নয়।

অষ্টম নীতি ঃ
মুসলিম-বিদ্বেষী অমুসলিম মুসলিমের বন্ধু নয়

অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক গড়ার ব্যাপারে সর্ববাদিসম্মত রায় এই যে, কোন কাফেরকে তার কুফরীর জন্য কোন পাপিষ্ঠকে তার পাপের জন্য বন্ধুরূপে গ্রহণ করা হারাম। অর্থাৎ, তার কুফরী ও পাপে সম্মতি ও সমর্থন প্রকাশ করে বন্ধুত্ব গড়া কোন মুসলিমের জন্য বৈধ নয়।

প্রথমতঃ মুসলিম-বিদ্বেষী কোন অমুসলিমদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু করা কুফরী। অর্থাৎ, তাদেরকে অভিভাবক করা, মুসলিমদের উপর তাদের বিজয়ের কামনা রেখে মুসলিমদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করা, তাদের ধর্মে মুগ্ধ হওয়া, তাদের ধর্মকে ইসলামের মতই একটা দ্বীন মনে করা, মুসলিমকে ছেড়ে তাদের উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসা রাখা, তাদের আচরণ পছন্দ করে তাতে তাদের অনুকরণ করা, ইত্যাদি। এ রকম করলে মুসলিম তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যায়।

এ বিষয়ে মহান সৃষ্টিকর্তা বলেন, "হে ঈমানদারগণ! ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে (অন্তরঙ্গ) বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।" *(সূরা মাইদাহ ৫১ আয়াত)*

দ্বিতীয়তঃ তাদের সহিত মৈত্রী ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা, তাদের পার্থিব উন্নতির জন্য তাদেরকে ভালোবাসা, তাদের পদলেহন করা, তাদের নিকট নিচু হওয়া ও তাদেরকে উঁচু করা, তাদের পালপর্বনে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করা, তাদের চরিত্র, আচরণ ও পর্বাদির অনুকরণ করা, ইত্যাদিতে মুসলিম ফাসেক হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! আমার ও তোমাদের শত্রুগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা ওদের সাথে বন্ধুত্ব করছ, যদিও ওরা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে (স্বদেশ হতে) বহিষ্কৃত করেছে; এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক, তবে কেন তোমরা ওদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক্ অবগত। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ করে, সে সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়।" *(সূরা মুমতাহিনাহ ১ আয়াত)*

এখানে মহান আল্লাহ যারা এ রকম করে তাদেরকে 'ঈমানদার' নামেই সম্বোধন করেছেন। অতএব বুঝা যায় যে, স্বধর্মে সন্দেহ করে নয়, বরং পার্থিব কোন স্বার্থ বা

উপকার লাভের আশায় তাদের সহিত বন্ধুত্ব করলে কুফরী হয় না, অবশ্য তাতে ফাসেকী হয়। যার জন্য যখন সাহাবী হাতেব বিন আবী বালতাআহ মুসলিমদের যুদ্ধপ্রস্তুতির কথা গোপনে চিঠি লিখে মক্কার কাফেরদেরকে জানিয়েছিলেন, তখন প্রিয় নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "তোমাকে এ কাজ করতে কে উদ্বুদ্ধ করল?" তিনি বলেছিলেন, 'আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান রাখি। তবে আমার ইচ্ছা ছিল, (মক্কার কাফের) সম্প্রদায়ের জন্য আমার এক প্রকার ইহসানী হবে, যার দ্বারা আল্লাহ আমার পরিবার ও সম্পদকে (তাদের অনিষ্ট থেকে) রক্ষা করবেন।' অতঃপর আল্লাহর নবী ﷺ তাঁকে কাফের বা মুনাফিক বলেননি।

তৃতীয়তঃ কাফেরদের সাহায্য ও সহায়তা গ্রহণ করা, কোন কাজে তাদেরকে ভাড়া করা বা মজুর নিযুক্ত করা, ইত্যাদি অবস্থা অনুপাতে প্রয়োজন ক্ষেত্রে কিছু শর্তের সাথে তা বৈধ।

চতুর্থতঃ মুসলিম-বিদ্বেষী নয় এমন অমুসলিমদের সহিত সদ্ব্যবহার ও সদ্ভাব রাখা, এক সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করা, (নফল সাদকাহ হতে) তাদেরকে দান করা, পরস্পরের মাঝে উপহার বিনিময় করা, তাদের দুর্বলদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা, পার্থিব কর্মে সহায়তা করা ও নেওয়া, ইত্যাদি কর্ম বৈধ। বরং মানবতার খাতিরে এমন সাম্প্রদায়িক-সম্প্রীতি বজায় রাখা কর্তব্য প্রত্যেক মুসলিমের।

এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

[illegible]

([illegible])

অর্থাৎ, দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ হতে বহিষ্কৃত করেনি, তাদের প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন ও ন্যায়-বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। *(সূরা মুমতাহিনাহ ৮ আয়াত)*

বলা বাহুল্য, এই নীতির নিরিখেও নির্ণয় করতে হবে অবলম্বনীয় পক্ষ।

নবম নীতি ঃ
বর্তমান ঘটনার সাথে শরয়ী বাণীর সামঞ্জস্য সাধন না করা

ফিতনা প্রসঙ্গে সমুদয় হাদীসের বক্তব্যকে বর্তমান যুগের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করা উচিত নয়। ফিতনা যখন উপস্থিত হয়, তখন সাধারণতঃ মানুষ ফিতনার ঐ সকল হাদীসগুলিকে নিয়ে আলোচনা করতে এক প্রকার মিষ্ট স্বাদ অনুভব করে। প্রত্যেক জালসা-জলুসে ঐ কথারই চর্চা হয়ে থাকে। মহানবী ﷺ এই বলেছেন, এটাই তার সময়। এটাই সেই ফিতনা--- ইত্যাদি।

অথচ সলফে সালেহীন আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, বর্তমান ফিতনার সাথে ফিতনার হাদীসগুলির সম্পর্ক কায়েম করা উচিত নয়। যেহেতু প্রিয় নবী ﷺ-এর (সাধারণ ফিতনা প্রসঙ্গে) ঐ উক্তি কোন একটি ফিতনার সহিত নির্দিষ্ট না হয়ে যথাক্রমে আগত ও আগামী সকল ফিতনার উপর সাধারণ ও ব্যাপক থেকে বারবার

তাঁর সত্যতার বহিঃপ্রকাশ হবে। আর সকল ফিতনা থেকে সাবধান ও দূরে থাকা সকলের কর্তব্য হবে।

উদাহরণ স্বরূপ, "অবশ্যই আখেরী যামানার ফিতনা আমারই বংশধরের কোন এক ব্যক্তির নিকট হতে উদ্ভব হবে" -রসূল ﷺ-এর এই কথার ব্যাখ্যায় অনেকে বলেছেন যে, 'ঐ ব্যক্তি অমুকের পুত্র অমুক।'

যেমন তাঁর উক্তি "অতঃপর সকল লোকে একজন অযোগ্য লোককে নেতা করে সন্ধি করে নেবে।" এর ব্যাখ্যায় অনেকে নির্দিষ্ট করে বলেন, 'অমুকের পুত্র অমুক।'

অনুরূপভাবে তাঁর বাণী, "তোমাদের ও রোমানদের মাঝে নিরাপদ সন্ধি স্থাপিত হবে---" এবং এরপর যা হবে- সে প্রসঙ্গে অনেকে বলেন, সেই ঘটিতব্য সময় এটাই। ইত্যাদি।

এই ধরনের সমন্বয় সাধন করা, বর্তমান ফিতনা ও পরিস্থিতিকে হাদীসে বর্ণিত বক্তব্যের মাঝে সীমাবদ্ধ করা এবং তা মুসলিমদের মাঝে প্রচার করা আহলে সুন্নাহর নীতি ও পদ্ধতি নয়।

আহলে সুন্নাহ বর্তমান ফিতনার সহিত হাদীসে বর্ণিত ভবিষ্যৎ বাণীর কোন সঙ্গতি সাধন না করে ঐ সমস্ত হাদীস বর্ণনা করে থাকেন এবং ফিতনা হতে সাধারণভাবে মানুষকে সতর্ক ও সাবধান করে থাকেন। তাতে জড়িয়ে পড়তে বা তার নিকটবর্তী হতে বাধা দান করেন। যাতে সর্বনাশী ধ্বংসলীলা ব্যাপকতা লাভ না করতে পারে এবং রসূল ﷺ-এর ভবিষ্যৎ বাণীর সত্যতা বারবার প্রমাণিত হতে থাকে।

মহানবী ﷺ বলেন,
"ফিতনার সময় ইবাদত করা, (সওয়াবে) আমার কাছে হিজরত করে আসার সমান।" *(মুসলিম, মিশকাত ৫৩৯১নং)*

পরিশেষে মহানবীর কয়েকটি ভবিষ্যৎ-বাণী উল্লেখ করে এ বিষয়ের ইতি টানছি ঃ

"অনতি দূরে সকল বিজাতি তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন ভোজনকারীরা ভোজপাত্রের উপর একত্রিত হয়। (এবং চারিদিক থেকে ভোজন করে থাকে।)" একজন বলল, 'আমরা কি তখন সংখ্যায় কম থাকব, হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক থাকবে। কিন্তু তোমরা হবে তরঙ্গতাড়িত আবর্জনার ন্যায় (শক্তিহীন, মূল্যহীন)। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! দুর্বলতা কি?' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মরতে না চাওয়া।" *(আবূ দাউদ ৪২৯৭, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৭৮)*

"ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং

বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" *(মুসলিম ২৮৮৬, মিশকাত ৫৩৮৪নং)*

"ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত করে নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪২৬১নং, ইবনে মাজাহ)* "তুমি তাতে আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।" *(আহমাদ, হাকেম, ত্বাবরানী, আবূ য়্যা'লা)*

সাহাবী হযরত হুযাইফাহ বিন য়্যামান বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূর্খতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ আছে।" আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।" (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কি?' তিনি বললেন, "এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত পথনির্দেশ ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং কিছু কাজকে অদ্ভুত (ও মন্দ) জানবে।" আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দন্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।'

তিনি বললেন, "তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, 'আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, "মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, "ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৮২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল 'বিদআত'। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

তিনি বলেন, "নিশ্চয় ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামী হবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

আর সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, 'হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।' *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

সমাপ্ত